সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর মুখপত্র
চতুর্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ›› জানুয়ারি ২০১৮ ›› পাঁচ টাকা

যে হাত সভ্যতা বাঁধাই করে

পুরান ঢাকার কাগজীটোলা, শ্যামবাজার কিংবা ফরাসগঞ্জের রাস্তা। রাস্তার ধারের অধিকাংশ বাড়িই পুরনো। আর বেশিরভাগ বাড়ির নিচতলা জুড়ে চলে কর্মযজ্ঞ- বই বাঁধাইয়ের কাজ। জানুয়ারির বই উৎসব, *(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

শিক্ষাব্যবস্থায় চরম নৈরাজ্য, রমরমা বাণিজ্য

লোকটা মজুর। কারওয়ান বাজারে মাল বইতে বইতে রাত কেটে যায় তার, কারণ তখন ট্রাকগুলো আসে সারাদেশ থেকে, মাল খালাস করতে হয়। সেই কাজ সেরে ক্লান্ত দেহে সকালে যারা বাজার করতে আসে, তাদের ফরমায়েশি করে তার আরও কিছু টাকা ওঠে। সকালবেলা ঝাঁকে ঝাঁকে ফুটফুটে ছেলেমেয়েগুলো যখন স্কুলে যাওয়ার জন্য বের হয়, সে তখন একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তাদের দিকে। এত কষ্টের রোজগার তার। এর একটা বড় অংশই যায় তার দু'টো ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার জন্য।

আপনাকে অফিসে পৌঁছে দেবে যে সিএনজি চালক, সে আপনার ডাকে সাড়া না দিয়ে চলে যাচ্ছিল। আপনি নরম গলায় একটু অনুরোধ করতে সে-ও একটু নরম হলো। বলল, 'পারব না ভাই, আজ মেয়ের স্কুলে পরীক্ষা, দিয়ে আসতে হবে।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রিকশা নিয়েছেন। যাবেন শাহবাগ থেকে নীলক্ষেত। কোনো এক কথা প্রসঙ্গে চালকের সাথে একটু ভাব জমে গেল। এ কথা সে কথার মাঝখানে সে হঠাৎ মুখটা উজ্জ্বল করে বলে উঠল, 'আপনি ভার্সিটির ছাত্র? আমার ছেলেও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে।'

অফিসের পিয়ন থেকে শুরু করে বাসার কাজের লোক; ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দোকানদার থেকে শুরু করে শিক্ষক ও চাকুরিজীবী টিকে থাকার জন্য দিনরাতের এই অন্তহীন পরিশ্রমের পেছনে তাদের একটা বড় উদ্দীপনা হলো–ছেলেমেয়েগুলো যাতে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়। তার ছেলেমেয়েদের জীবন যাতে তার মতো কষ্টের না হয়। এজন্য সে তাদের লেখাপড়া শেখায়। সংসারের অনেক কিছু কেটেছেঁটেও সে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়াটা করাতে চায়। কিন্তু দেশের শিক্ষাব্যবস্থার গতিপথ কি তাদের স্বপ্নগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার দিকে যাচ্ছে? *(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

২০১৮ সাল হোক
সমাজের সকল অন্যায়কে প্রতিরোধ করার বছর

ক্যালেন্ডারের পাতা ওল্টালেই নতুন বছর। আরেকটি রাত পেড়িয়ে দিন। বাহ্যত খুব বেশি পার্থক্য চোখে পড়বে না। কিন্তু তবুও মানুষ নতুন বছর শুরু করে নতুন স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। আর করে পেড়িয়ে যাওয়া সময়ের হিসাব-নিকাশ। কী পেলাম আমরা পুরনো বছরে? ২০১৭ সাল ছিল বহু ঘটনায় আলোচিত। আসলে ঘটনা নয়, দুর্ঘটনায়। একটির তাৎপর্য ছাড়িয়ে গেছে আরেকটিকে। কেবল সংখ্যার ক্ষেত্রে নয়, মাত্রার ক্ষেত্রেও। খুন-ধর্ষণ-গুম কী হয়নি? শুধু মানুষের উপর নির্যাতন নয়, প্রকৃতি-পরিবেশও ছিল এর শিকার। মোটা চালের দামবৃদ্ধি অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙেছে। সমাজে বেপরোয়া ছিল সমাজ বিরোধীরা, সড়কে ছিল চালকেরা। সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতিদিনই গড়ে প্রাণ হারিয়েছে ১২ জন মানুষ। কোনো শ্রমিক হত্যারই বিচার হয়নি। কৃষকের চোখের জল মোছেনি, পায়নি তারা ফসলের ন্যায্য দাম। এমন পরিস্থিতিতে কেমন যাবে ২০১৮ সাল?

মানুষ যখন সংকটের উৎস খুঁজে পায় না, করণীয় নির্ধারণ করতে পারে না, তখন বেছে নেয় আত্মহননের পথ। গত বছরের শুরুতেই তেমনই একটি ঘটনা এসেছিল সবগুলো প্রচার মাধ্যমে। ঢাকা শহরের একটি নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ে ভয়াবহ ঘটনা ঘটিয়েছিল। হত্যা করেছিল নিজেকে, তারও আগের নিজের দুই সন্তানকে। মেয়েটি ছিল অন্তসত্ত্বা, তাই প্রাণ গেছে আরও একজনের। স্বামীর কাছ থেকে নিত্যদিনের শারীরিক নির্যাতন, মানসিক খোটা সহ্য করতে পারেনি মেয়েটি। আত্মবিনাশের পথে খুঁজে নিয়েছিল সমাধানের পথ। মেয়েটির ছিল না বেঁচে থাকার সহনীয় পরিবেশ, কেননা তার স্বামী বাড়ি থেকেই বের হয়ে যেতে বলেছিল। লম্পট স্বামীর হাত থেকে বাঁচার জন্য একাই যে লড়বে তারও উপায় ছিল না, কেননা সে ছিল এক দরিদ্র ঘরের সন্তান। এমন দুঃখের মহাসমুদ্রে একা একা ভেসে থাকা যায় না। তাই তো নিজেকেই শেষ করে দিয়েছে সে। তবু একটি প্রশ্ন না এসে পারে না – এটি কি আত্মহত্যা নাকি হত্যা? এই পঁচে যাওয়া সমাজ কি তাকে সেই পথে ঠেলে দেয়নি? বেঁচে থাকার সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে সমাজই কি তাকে হত্যা করেনি?

এমন করুণ পরিণতি কেবল দরিদ্র মেয়েটির নয়, পথে-ঘাটে-বস্তি-দালানে, স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা-বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কারখানা-অফিস-আদালত সব জায়গায়। কোথাও মেয়েরা নিরাপদে নেই। অহরহ ঘটছে শারীরিক-মানসিক নির্যাতনের ঘটনা। ধর্ষণ-গণধর্ষণ তো বটেই, বিকৃত যৌন নির্যাতনের বর্ণনা ভাষা প্রকাশ অসম্ভব। *(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

গুম এবং ফিরে আসার রহস্য
রাষ্ট্রীয় আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত বেঁচে থাকার অধিকার

গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়ের একটি হল 'গুম'। ২০১৭ সালের শেষ দিকে এই 'গুম-অপহরণ' নানা কারণেই আলোচনায় প্রাধান্য পায়। কবি ও বুদ্ধিজীবী ফরহাদ মজহারের গুম-অপহরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় চলে আসে। এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই পর পর কয়েকটি গুমের ঘটনা এবং গুম থাকা কয়েকজন ব্যক্তির ফিরে আসার ঘটনা ঘটেছে এ সময়ে। ফিরে আসা ব্যক্তিদের কেউ কেউ জানিয়েছেন তারা সন্ত্রাসীদের দ্বারা অপহরণের শিকার হয়েছিলেন, মুক্তিপণ আদায় ছিল গুমের উদ্দেশ্য। যদিও তাদের বক্তব্য মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা পায়নি।

মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর হিসাব অনুযায়ী, ২০১৪ সাল থেকে ২০১৭ সালের জুন পর্যন্ত সাড়ে তিন বছরে নিখোঁজ বা অপহরণের শিকার হয়েছেন ২৮৪ জন। তাদের মধ্যে মৃতদেহ উদ্ধার হয় ৪৪ জন ব্যক্তির। নিখোঁজের পর গ্রেপ্তার দেখানো হয় ৩৬ জনকে এবং পরিবারের কাছে বিভিন্নভাবে ফিরে আসেন ২৭ জন। আসক-এর প্রতিবেদনে এসব গুম-অপহরণের ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী।

বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ২০১৩ সাল থেকে শত শত মানুষকে বেআইনিভাবে গোপন স্থানে আটকে রেখেছে বলে *(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

জেরুজালেম নিয়ে ট্রাম্পের ঘোষণা
ধর্ম নয়, অস্ত্র বিক্রির বাজারটাই আসল কথা

জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী ঘোষণার মধ্য দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন আধিপত্যের নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটালো ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্পের এ ঘোষণা কেবল ফিলিস্তিনে নয়, সারা পৃথিবীতে সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও উগ্রতাকে উসকে দিয়েছে।

জেরুজালেম মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদি- এই তিন ধর্মাবলম্বীর কাছে পবিত্র শহর। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতে ইসরায়েল দীর্ঘদিন ধরে ফিলিস্তিনে বার বার হানা দিয়েছে, জেরুজালেম শহরটিও বার বার তাদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছে। ইসরায়েল রাষ্ট্র তৈরি হওয়ার বহু আগে থেকে বিভিন্ন আরব জাতিগোষ্ঠীর বাসস্থান হিসেবে ফিলিস্তিনের অস্তিত্ব ছিল। বিশ শতকের গোড়ার দিকে ইউরোপের ইহুদিদের মধ্য থেকে ফিলিস্তিনে একটি ইহুদি রাষ্ট্র গড়ে তোলার চিন্তা করা হয়। ধনী ইহুদিরা ফিলিস্তিনে জায়গা-জমি কিনে নিয়ে বসবাস চালাতে থাকে। ফিলিস্তিনের গরীবরা তাদের শ্রমিক হিসেবে *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

২০১৮ সাল হোক সমাজের সকল অন্যায়কে প্রতিরোধ করার বছর

(১ম পৃষ্ঠার পর) চার বছরের শিশু কন্যা থেকে ষাট বছরের বৃদ্ধা – কেউই এই নির্মমতার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। স্বাধীন দেশে এত এত ঘটনা ভাবাটাই কঠিন। পত্রিকায় এসেছে, 'গণধর্ষণের বিচার চাইলেন মুক্তিযোদ্ধা কন্যা'। খবরের ভিতরে বাবার আক্ষেপ, 'আমি দেশের জন্য যুদ্ধ করেছি। আজ দেশ আমাকে এই মহৎ পুরস্কার দিল।' স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে হলে মেয়েটির হয়তো পাকিস্তানিদের হাতে নির্যাতিত হবার ভয় থাকত। জন্ম নিয়েছে সে স্বাধীন দেশে, নির্যাতিত হলো সেই দেশের একদল পাষণ্ডদের কাছে।

মানুষকে রক্ষা করবে কে? আইন শৃঙ্খলা বাহিনী? পুলিশ-র‍্যাব? তারা নিজেরাই তো অপকর্মের হোতা। পত্রিকায় খবর এসেছে *(১৯ মে '১৭, ডেইলি স্টার)* পুলিশ বাহিনীর মহিলা সদস্যদের উপর ওই বাহিনীর পুরুষ সদস্যদের যৌন হয়রানি এখন বেশ সাধারণ ঘটনা। প্রতিবেদনে এসেছে হালিমা নামের একজন মহিলা কনস্টেবলের কথা যে একই থানার সাব ইন্সপেক্টরের দ্বারা একাধিকবার ধর্ষিত হয়েছে। ঊর্দ্ধতন পুলিশ অফিসারকে বারবার জানালেও বিচার পায়নি সে। কোনো পথ না পেয়ে অপমানের জ্বালায় কাপড়ে কেরোসিন ঢেলে নিজেকে পুড়িয়ে মেরেছে। যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নিজেদের মধ্যে ঘটে যাওয়ার নিপীড়নের শাস্তির বিধান করতে পারে না তারা দেশের অপরাধীদের বিচার কীভাবে করবে?

পরিসংখ্যান বলছে গত ১৬ বছরে ৪৫৪১টি ধর্ষণের মামলা হলেও মাত্র ৬০টি ঘটনায় দোষীদের শাস্তি হয়েছে। *(১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭, দৈনিক প্রথম আলো)* এই হিসাব কেবল কাগজে কলমে বা প্রচার মাধ্যমে সামান্যই এসেছে। এর বাইরেও যে কত ঘটনা ঘটে তার কি কোনো ইয়ত্তা আছে?

শুধু নারী নির্যাতন নয়, হত্যা-খুন-গুম মাত্রা ছাড়িয়েছে। এসবের সাথে যুক্ত আছে স্বয়ং রাষ্ট্রীয় বাহিনী। আমরা নারায়ণগঞ্জের ঘটনা বিস্মৃত হইনি। প্রমাণ পাওয়া গেছে, নারায়ণগঞ্জে র‍্যাবের একটি ইউনিট একসাথে সাতজনকে খুন করে নদীতে ফেলে দিয়েছে। রাষ্ট্রীয় একটি বাহিনী পরিণত হয়েছে ভাড়া খাটা খুনীতে। ক্রসফায়ার-এর নামে মানুষ হত্যা পরিণত হয়েছে নিত্যদিনের ঘটনায়। প্রতিটি হত্যার পিছনে একই গল্পের মঞ্চায়ন একঘেয়েমি তৈরি করলেও রাষ্ট্রীয় এই বাহিনীটির বেপোরোয়া মনোভাবের ব্যাপারে লুকানোর কিছুই নেই। অন্যদিকে নারায়ণগঞ্জেই ফুটফুটে কিশোর তানভীর মুহম্মদ তুকীকে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। কারা ঘটালো তাও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আজও প্রকৃত খুনীরা ধরা পড়ল না, শাস্তি তো দূরের কথা। আলোচিত সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি হত্যার কয়েক বছর অতিক্রান্ত হলো। হত্যাকাণ্ডের পরপরই তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন, '৪৮ ঘন্টার মধ্যে সাগর-রুনী হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করা হবে।' আজও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। এই দম্পত্তির একমাত্র সন্তানটির নিটোল চোখের করুণ আবেগ দেখে চোখে পানি ধরে রাখা কঠিন হলেও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের তাতে কিছুই যায় আসে না। এমন আরও বহু ঘটনা আছে। কলেজ ছাত্রী সোহাগী জাহান তনু কুমিল্লার সবচেয়ে 'নিরাপদ' জায়গা ক্যান্টনমেন্টে নৃশংসভাবে খুন হলো। তনুর মা স্পষ্টভাবে খুনীদের নাম বললেন, যারা সেনাবাহিনীরও সদস্য। কিন্তু কেউ ধরা পড়ল না।

অথচ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো যখন সরকারের নানা অপকর্মের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামে, তখন দেখা যায় রাষ্ট্রীয় বাহিনীর শক্তির মহড়া। যেমন- সুন্দরবন রক্ষার আন্দোলন, গ্যাস-বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষার আন্দোলন, গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনবিরোধী আন্দোলন ইত্যাদিতে কীভাবে পদে পদে বাধা দেয়া যায়, বিক্ষোভ তীব্র হবার লক্ষণ দেখলে কেমন করে লাঠি, টিয়ার গ্যাস, জলকামান, নতুন আবিষ্কার 'সাউন্ড স্টিমুলেটর' ব্যবহার করা যায় – এসব দেখলে সরকারের পেটোয়া বাহিনীর দক্ষতা নিয়ে কোনো প্রশ্নই উঠবে না। দেশে ন্যূনতম গণতান্ত্রিক পরিবেশও সরকার রাখেনি। প্রধান বিরোধী দল বলে যারা পরিচিত, যদিও তারা একই শ্রেণির, তাদের সভা-সমাবেশ করারও অনুমতি সরকার দিচ্ছে না বহুদিন ধরে, বরং সামান্য মিছিল-মিটিং করলেই হামলা-মামলা দিয়ে বিরোধী নেতা-কর্মীদের নাজেহাল করে ছাড়ছে।

সামান্য প্রতিবাদও সরকারের সহ্যের অতীত। এমনকি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও মানুষ তার প্রতিবাদটুকু জানাতে পারবে না। জাতির পিতা, প্রধানমন্ত্রী, স্বাধীনতা যুদ্ধ কিংবা সরকারের কর্মকাণ্ড – কোনো কিছু নিয়েই ভিন্ন কোনো মত উপস্থাপন করা যাবে না। বলতে হলে সরকারের বয়ানেই তা বলতে হবে। এর অন্যথা হলে রয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারার খড়্গ। চট্টগ্রামে নবম শ্রেণির এক প্রশ্নপত্রে এমনি এক অবমাননার অভিযোগ তুলে ১৩ জন শিক্ষককে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। (২৩ *আগস্ট* '১৭, *বিবিসি)* একটা মিথ্যা অভিযোগে যখন শিক্ষকদেরও জেলের ঘানি টানানো যায়, তখন আর মান-সম্মান নিয়ে এ সমাজে বেঁচে থাকার পথ থাকে না। এতসব অন্যায়ের পরও কিছুটা হলেও যাবার জায়গা ছিল আদালত। সেটিও ক্ষমতাসীনদের একদম পদতলে। নিম্ন আদালত তো সম্পূর্ণ সরকারের অধীন। নিম্ন আদালতে সরকার দলীয় নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে বিচারাধীন প্রায় সাত হাজারের বেশি মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে। এসবের মধ্যে এমনকি খুনের মামলাও আছে। উচ্চ আদালতের হাল কী – তা কিছুদিন আগে প্রত্যক্ষ করেছে দেশের মানুষ। সংবিধান মোতাবেক রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর পরই যার অবস্থান সেই প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহাকে কীভাবে টেনে হিচড়ে তাঁর পদ থেকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে। এতবড় পদে আসীন থাকা একজন ব্যক্তির যখন এই হাল হয়, তখন সাধারণ মানুষের অবস্থা কী, তা সহজেই অনুমেয়।

দেশের এমন সংকটকালে তরুণ-যুবকদের প্রতিবাদ করার কথা ছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেছিলেন, 'বসিয়া আছ কেন আপন মনে/ স্বার্থনিমগ্ন কী কারণে?' হৃদয় প্রসার করে চারিদিকের এত এত অন্যায়-নিপীড়ন যে তরুণরা দেখতে পারছে না, তার কারণ আছে বহুবিধ। তাদের মনে গেঁথে দেয়া হচ্ছে অর্থ-বিত্ত-প্রতিষ্ঠার প্রবল ছাপ। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, পেশি শক্তির জয়জয়কার আর পরিবার থেকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান সবক্ষেত্রে নীতি-নৈতিকতার প্রবল সংকট প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে 'যেভাবেই হোক অঢেল টাকার মালিক হতে হবে।' টাকা হলেই পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়বে সব। গত ৩০ ডিসেম্বরে পত্রিকায় এসেছে এক ৩৩ বছরের তরুণের কথা। যে মাত্র কয়েক বছরে রাস্তার টোকাই থেকে হয়ে উঠেছে শত কোটি টাকার মালিক। কীভাবে? কোন ব্যবসা করে? ব্যবসা হলো ইয়াবাসহ নেশাজাতীয় পণ্যের। একা একা তো নিশ্চয় এত টাকার মালিক হওয়া সম্ভব ছিল না। হয়তো সাহায্য ছিল সমাজের তেমন 'গণ্য-মান্যদের'। যদিও সেগুলো খবরে বেশি আসে না। আসবে কী করে? তাদের তো মস্ত খুটির জোর! এই যেমন, সকলে জানে দেশের ইয়াবা চালানের একটা বড় রুট টেকনাফ, সেখানকার এমপি আব্দুর রহমান বদি হলো এই মাদক ব্যবসার হোতা। বদির বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ প্রমাণিত হলেও কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এই বদিকেই কিছুদিন আগে দেখা গেছে প্রধানমন্ত্রীর পাশে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে, প্রধানমন্ত্রীর সাথে হাস্যোজ্জ্বল মুখে পানিতে পা ডুবিয়ে হাঁটতে! এমন ব্যক্তির টিকি ছোঁয়ার সাধ্যও কি কারও আছে? কেবল দুঃখজনক ঘটনা হলো এই, এরা যাদের কাছে ইয়াবা বিক্রি করে সেই কোটি তরুণ-তরুণীরা মাদকের নীল ছোবলে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। যৌবনের স্বপ্ন-সাধ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে স্পর্ধা নুইয়ে পড়ছে কোনমতে দিন যাপনের গ্লানিতে। হারিয়ে ফেলছে ন্যায়-অন্যায় বোঝার শক্তিটুকু। জাতির মেরুদণ্ড ক্ষয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন।

প্রতিবাদের শক্তি যখন দুর্বল হয়, অন্যায়ের শক্তি তখন সংহত হয় দিনদিন। সমাজে শোষণ-জুলুম বাড়ে। বাংলাদেশে আজ তেমনই পরিস্থিতি। রিপোর্টে এসেছে, স্বাধীনতার পর সবচেয়ে বেশি আয়বৈষম্য চলছে বর্তমানে। জাতীয় আয়ের অর্ধেকই উচ্চ আয়ের ১০ শতাংশ মানুষের। *(১৯ আগস্ট '১৭, দৈনিক বণিক বার্তা)* সরকারের তথাকথিত উন্নয়ন আর বৈষম্য বাড়ছে হাত ধরাধরি করে। ধনী হচ্ছে আরও ধনী, তাই গরীব হচ্ছে আরও নিঃস্ব, অসহায়। একদিকে দেশের মাত্র ৫টি পরিবারের হাতে জাতীয় আয়ের ২৮ শতাংশ সম্পত্তি জমা হয়েছে, অন্যদিকে শেরপুরে ভাতের অভাবে কিশোরী আত্মহত্যা করেছে। এমনই বৈপরীত্য! ব্যাংকগুলো হয়েছে হরিলুটের কেন্দ্র। প্রায় সমস্ত ব্যাংক অর্থ পাচার, অবৈধ লেনদেনে বিপর্যস্ত। ব্যাংক থেকে সাধারণ মানুষের সঞ্চিত টাকা পুঁজিপতিরা ঋণ হিসেবে নিয়ে পাচার করছে বিদেশে। এভাবে গত ৬ মাসেই প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা খেলাপি ঋণ হয়েছে। এসব দেখার যেন কেউ নেই। এত কিছুর পরও সরকারের অর্থমন্ত্রী জনগণকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলেছেন! জনগণের সাথে প্রতিদিনই চলছে এমন নির্মম তামাশা।

সরকারের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান পরিণত হয়েছে দুর্নীতি আর লুটপাটের আখড়ায়। শিক্ষাব্যবস্থার এমন ভয়াবহ দুরবস্থা আগে কেউ প্রত্যক্ষ করেছে কিনা জানা নেই। প্রতিটি পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁস এখন স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছে। প্রথম শ্রেণি থেকে যেকোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা – কোটি কোটি টাকায় প্রশ্নপত্রের বাণিজ্য হচ্ছে বাংলাদেশে। শিক্ষামন্ত্রীর তাতে কিন্তু কোনো দায় নেই! তিনি বলেছেন, 'সেই ১৯৬১ সাল থেকেই প্রশ্নফাঁস হচ্ছে।' যেন জঘন্য কাজ বারবার করলে তা নীতিসিদ্ধ হয়ে যায়। কথা প্রসঙ্গে তিনি নিজেকে 'চোর' বলেছেন। কিন্তু তারপরও দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেননি। বরং সবাইকে 'সহনীয় মাত্রায়' ঘুষ খাবার পরামর্শ দিয়েছেন। শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্বে থেকে এমন নিম্নস্তরের রুচিহীন কথা কারও পক্ষে বলা সম্ভব, তা বিশ্বাস করাও কঠিন। এরা দেবে আমাদের শিক্ষার পাঠ!

যে শ্রম এমন বিপুল সম্পদের সৃষ্টি করছে সেই মানুষগুলো কেমন আছে? ভালো যে নেই তা তো বোঝাই যাচ্ছে। তাদের হাড় জিরজিরে শরীরটাকে ছিবড়ে, নিংড়ে নিয়ে পুঁজিপতিরা সম্পদের পাহাড় গড়লেও তাদের দুমুঠো খাবারেও বসিয়েছে মুনাফার থাবা। মোটা চালের দাম বেড়ে হয়েছিল ষাট টাকার উপরে, এমন কখনও হয়নি 'ধানের দেশ' বাংলাদেশে। বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে আটবার, গ্যাসের দামও বেড়েছে দফায় দফায়। বেড়েছে গাড়ি ভাড়া, বাড়ি ভাড়া। কিন্তু বাড়েনি মজুরি। গার্মেন্টস শ্রমিকের মজুরি আজও ৫০০০ টাকা। শুধু মজুরি নয়, মালিকের মুনাফার লোভে আজ পর্যন্ত যত শ্রমিক হত্যাকাণ্ড হয়েছে, তার কোনোটিরও বিচার করেনি সরকার। তাজরিন হত্যাকাণ্ডের পাঁচ বছর অতিবাহিত হলেও 'সাক্ষীর অভাবের' কথা বলে আজও দোষীদের বিচার হয়নি। টাম্পাকো হত্যাকাণ্ডের এক বছর অতিক্রান্ত হলো, ৪১ জন শ্রমিক মারা গেল, আজও দায়ীদের শাস্তি দেয়া হলো না। স্পষ্টতই বোঝা যায়, সরকার কার পক্ষে। যেন সরকার আর মালিক সহোদর।

মুনাফার উদগ্র লালসা যখন সাধারণের স্বার্থকে কেড়ে খায়, তার কাছে যে প্রকৃতিও রেহাই পাবে না – তা আর বিস্ময় কী? মানুষের কান্নাই যাদের মধ্যে কোনো সংবেদনশীলতা তৈরি করে না, তারা প্রকৃতি-পরিবেশের যন্ত্রণা বুঝবে কী করে? তাই তৎপর হয়ে উঠেছে প্রকৃতির এক অপার বিস্ময়, বাংলাদেশের 'ফুসফুস' খ্যাত সুন্দরবনকে ধ্বংস করতে। দেশের অভ্যন্তরে গত চার বছর ধরে ধারাবাহিক আন্দোলন, আপামর জনসাধারণের মতামত, দেশের বাইরে ইউনেস্কোসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের নিষেধ সত্ত্বেও সরকার সুন্দরবনের অদূরে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করছে। শুধু বিদ্যুৎকেন্দ্র নয়, সুন্দরবনের কোল ঘেষে ৩২০টি শিল্পকারখানাকে নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে সরকার। এসব ভারীশিল্প যে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে পুরোপুরি বিনষ্ট করবে, বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতি করবে – তার অসংখ্য বৈজ্ঞানিক যুক্তিপ্রমাণ হাজির করা হলেও সরকার কার্যত দেশের পুঁজিপতি এবং ভারতের পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করতেই এই অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তটি নিয়েছে।

এই হলো দেশের সাধারণ মানুষ, প্রকৃতি ও পরিবেশের অবস্থা – যা আমাদের নিত্যদিনের জীবনযাপনের সঙ্গী। গত ২০১৭ সাল আমাদের এভাবেই কেটেছে। এরই ধারাবাহিকতায় এসেছে ২০১৮ সাল। এ বছরের সূচনাই হয়েছে ভোটের কথা বলে। জাতীয় নির্বাচন হবে এ বছরের শেষে, তার আগে হবে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন। পত্রিকা, টেলিভিশনসহ অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে শুরু হয়ে গেছে এর ভীষণ প্রচার। আসছে সময়ে তা আরও তীব্র হবে। ভোটে বিএনপি অংশগ্রহণ করবে জানিয়েছে। কিন্তু আপাত অর্থেও একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আওয়ামী লীগ করবে কি না এ নিয়ে সংশয় এখনও আছে। রংপুর সিটি কপোরেশন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ এই বার্তা দিতে চাইছে যে, তার অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়। কিন্ত এ বার্তায় কেউ আশ্বস্ত হয়েছে বলে মনে হয় না। আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদী শাসনের উপর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ মানুষ হয়তো বিএনপি-কেই ভোট দেবে। তবে তাতে মানুষের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হবে না। মানুষ যতক্ষণ না এই সংকটের কারণ ধরতে পেরে এই সমাজব্যবস্থাকেই উচ্ছেদের সংগ্রামে লিপ্ত হচ্ছে, ততক্ষণ এই ভোট ভোট খেলা চলতেই থাকবে। এটি নতুন কিছু নয়। অনেক আগে থেকেই এ জিনিস চলে আসছে। সেই ১৯৭০ সালেই যখন অবিভক্ত পাকিস্তানে নির্বাচন এসেছিল, মওলানা ভাসানী বলেছিলেন, "ভোট মনে হয় আজ সকলের ঠোঁট ফাটাইয়া দিয়াছে, 'ভোট ভোট' করিয়া দেশে আজ হায় মাতম শুরু হইয়া গিয়াছে।... সমস্যা-সাগরের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে পতিত হইয়া বাঁচিবার জন্য অনেকে আজ পথ হাতড়াইতেছেন। ... যতবারই দেশ কোনো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সঙ্কটে পতিত হইয়াছে, ততবারই এই ভোটের আশ্রয় লওয়া হইয়াছে, সঙ্কট ত্রাণের একমাত্র পরিত্রাণ হিসাবে ভোট গ্রহণ করা হইয়াছে, সঙ্কটের সুদীর্ঘ রাস্তা পাড়ি দেওয়ার জন্য ভোটের উপর সওয়ার করা হইয়াছে, সমস্যা-সঙ্কট হইতে বাঁচিবার জন্য ভোটের আশ্রয় লওয়া হইয়াছে।" ভাসানী 'ভোটের আগে ভাতের কথা' বলেছিলেন। আজ অবশ্য জনগণ দুটোই হারিয়েছে। বর্তমান সরকার ভাতের পাশাপাশি ভোটের অধিকারও কেড়ে নিয়েছে। গত ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারিতে তারা এমনই এক নির্বাচন করেছে, যেখানে ১৫৪টি সিটে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিল বিনাভোটেই! জনগণ তাদের মত দেবারও ফুরসৎ পায়নি! এবারের নির্বাচন এর থেকে ভাল বা এর থেকে খারাপ যাই হোক না কেন, তাতে নির্বাচন ভালো-মন্দ হবে, মানুষের জীবনে মন্দ বৈ ভালো কিছু হবে না।

তাই কেমন কাটবে আমাদের আগামীর সময়গুলো তা হয়তো বলাই যায়। কিন্তু চারপাশে এই যে এত এত সংকট তা থেকে আমরা বাঁচব *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

কার্ল মার্কস

ভ. ই. লেনিন

(এ বছর মহান দার্শনিক, সর্বহারা শ্রেণির নেতা ও শিক্ষক মহামতি কার্ল মার্কসের (৫ মে, ১৮১৮ – ১৪ মার্চ, ১৮৮৩) দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী। বিশ্বজুড়ে এই মহান মানুষটির শিক্ষা, জীবন সংগ্রাম নিয়ে নানা আলোচনা চলছে। সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীর মেহনতি-শোষিত মানুষের মুক্তি সংগ্রামের জন্য কার্ল মার্কসের চিন্তা অনুসরণ করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। সেই প্রেক্ষাপটে আমাদের দল বাসদ (মার্কসবাদী) কার্ল মার্কসের জন্ম দ্বিশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন এবং তাঁর নানা অবদান জনগণের মধ্যে তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছে। সাম্যবাদ-এর বিভিন্ন সংখ্যায় এ নিয়ে লেখা প্রকাশিত হবে। এবারের সংখ্যায় মহান রুশ বিপ্লবের রূপকার মহামতি ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের কার্ল মার্কসের জীবনী সম্পর্কিত প্রবন্ধের একটি অংশ উদ্ধৃত হলো।)

নতুন পঞ্জিকা অনুসারে ১৮১৮ সালের ৫ মে ত্রিয়ার শহরে (প্রাশিয়ার রাইন অঞ্চলে) কার্ল মার্কসের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন অ্যাডভোকেট, ইহুদি, ১৮২৪ সালে তিনি প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। পরিবারটি ছিল সমৃদ্ধ ও সংস্কৃতিবান কিন্তু বিপ্লবী নয়। ত্রিয়ারের স্কুল থেকে পাশ করে মার্কস প্রথমে বন এবং পরে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন ও আইনশাস্ত্র পড়েন। কিন্তু বিশেষ করে অধ্যয়ন করেন ইতিহাস ও দর্শন। ১৮৪১ সালে পাঠ সাঙ্গ করে এপিকিউরসের* দর্শন সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির থিসিস পেশ করেন। দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে মার্কস তখনো ছিলেন হেগেলপন্থী ভাববাদী। বার্লিনে তিনি 'বামপন্থী হেগেলবাদী' (ব্রুনো বাউয়ের প্রভৃতি) গোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ রাখতেন। হেগেলের** দর্শন থেকে এঁরা নাস্তিক ও বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত টানার চেষ্টা করতেন।

বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করে অধ্যাপক হবার আশায় মার্কস বন শহরে আসেন। কিন্তু সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির ফলে (ওই সরকার ১৮৩২ সালে ল্যুদভিগ ফুয়েরবাখকে অধ্যাপক পদ থেকে বিতাড়িত করে ও ১৮৩৬ সালে ফের তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অনুমতি দেয় না, ১৮৪১ সালে বন-এ তরুণ অধ্যাপক ব্রুনো বাউয়েরেরও বক্তৃতার অধিকার কেড়ে নেয়) মার্কস অধ্যাপক জীবন ছাড়তে বাধ্য হন। সে সময়ে জার্মানিতে বামপন্থী হেগেলবাদীদের মতামত অতিদ্রুত বিকশিত হয়ে উঠেছিল। ১৮৩৬ সালের পর থেকে ল্যুদভিগ ফুয়েরবাখ বিশেষ করে ধর্মতত্ত্বের সমালোচনা শুরু করেন এবং আকৃষ্ট হন বস্তুবাদের দিকে, যা ১৮৪১ সালে তাঁর মধ্যে (খ্রিস্টধর্মের সারমর্ম) প্রধান হয়ে ওঠে। ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'ভবিষ্যৎ দর্শনশাস্ত্রের মূলসূত্র'। ফুয়েরবাখের এই সব রচনা সম্পর্কে এঙ্গেলস পরে লিখেছিলেন, 'অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে এই সব বইয়ের 'মুক্তি ক্রিয়া নিজের অভিজ্ঞতায় অনুভব করার মতো'। 'আমরা সকলে (মার্কস সহ বামপন্থী হেগেলবাদীরা) তৎক্ষণাৎ ফুয়েরবাখপন্থী হয়ে গেলুম।' এই সময় বামপন্থী হেগেলবাদীদের সঙ্গে যাঁদের কিছু মিল ছিল রাইন অঞ্চলের এমন কিছু র‍্যাডিক্যাল বুর্জোয়া কলোন শহরে Rheinishche Zeitung নামে সরকারবিরোধী একটি পত্রিকা স্থাপন করেন। মার্কস ও ব্রুনো বাউয়েরকে পত্রিকাটির প্রধান হবার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ১৮৪২ সালের অক্টোবরে মার্কস পত্রিকাটির প্রধান সম্পাদক হয়ে বন থেকে কলোনে চলে আসেন। মার্কসের সম্পাদনায় পত্রিকাটির প্রধান সম্পাদক হয়ে বন থেকে কলোনে চলে আসেন। মার্কসের সম্পাদনায় পত্রিকাটির বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক প্রবণতা উত্তরোত্তর স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে এবং সরকার পত্রিকাটির উপর প্রথমে দুই দফা ও তিন দফা সেন্সর ব্যবস্থা চাপায় এবং পরে ১৮৪৩ সালের মার্চ মাসে সেটি বন্ধ হয়ে গেল। ... তাছাড়াও মোসেল উপত্যকায় আঙ্গুর চাষীদের অবস্থা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন এঙ্গেলস। পত্রিকার কাজ করে মার্কস বুঝলেন রাজনীতি-সংক্রান্ত অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় নেই, তাই এ বিষয়ে তিনি সাগ্রহে পড়াশুনা শুরু করলেন।

১৮৪৩ সালে ক্রয়েজনাখ শহরে মার্কস জেনি ফন ভেস্টফালেনকে বিয়ে করেন। জেনি তাঁর বাল্যসহচরী, ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁদের বাগদান হয়ে ছিল। মার্কসের স্ত্রী প্রাশিয়ার এক প্রতিক্রিয়াশীল অভিজাত পরিবারের মেয়ে। প্রাশিয়ার এক সর্বাধিক প্রতিক্রিয়াশীল যুগে, ১৮৫০-১৮৫৮ সালে এঁর বড়ো ভাই প্রাশিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। ... একটি র‍্যাডিক্যাল পত্রিকা বের করার জন্য মার্কস ১৮৪৩ সালের শরৎকালে প্যারিসে আসেন। Deutsch-Franzosische Jahrbucher নামে এই পত্রিকাটির শুধু একটি সংখ্যাই বের হয়েছিল। জার্মানিতে গোপন প্রচারের অসুবিধা এবং রুগের সঙ্গে মতান্তরের ফলে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। এই পত্রিকায় মার্কস যে-সব প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাতে তখনই তিনি আত্মপ্রকাশ করেন এমন এক বিপ্লবী রূপে যিনি বর্তমান সবকিছুর নির্মম সমালোচনা , বিশেষ করে অস্ত্রের সমালোচনা ঘোষণা করেছেন এবং আবেদন জানাচ্ছেন জনগণ ও প্রলেতারিয়েতের কাছে।

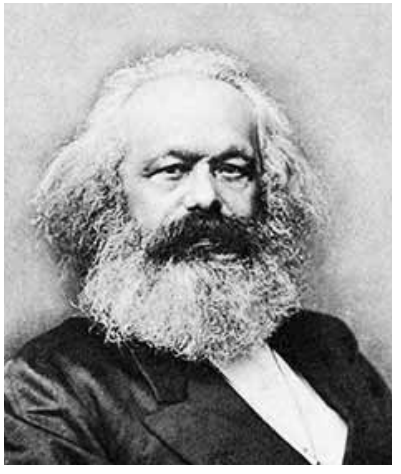

অভাব-অনটনে মার্কস ও তাঁর পরিবার একেবারে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ওঠেন; এঙ্গেলসের নিরন্তর ও আত্মোৎসর্গী অর্থ সাহায্য না পেলে মার্কসের পক্ষে 'পুঁজি' বইখানি শেষ করা তো দূরের কথা, অভাবের তাড়নায় তিনি নিশ্চিতই মারা পড়তেন

১৮৪৪ সালের সেপ্টেম্বরে ফ্রেডারিক এঙ্গেলস কয়েক দিনের জন্যে প্যারিসে আসেন এবং তখন থেকে মার্কসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠেন। উভয়েই তাঁরা প্যারিসের তদানীন্তন বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলোর উদ্দীপ্ত জীবনে অত্যন্ত সক্রিয় অংশ নেন এবং পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র সংক্রান্ত নানাবিধ মতবাদের সঙ্গে প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে বৈপ্লবিক প্রলেতারীয় সমাজতন্ত্র অথ বা কমিউনিজমের তত্ত্ব ও রণকৌশল গড়ে তোলেন। প্রাশিয়ান সরকারের দাবিতে ১৮৪৮ সালে বিপজ্জনক বিপ্লবী বলে মার্কসকে প্যারিস থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। অতঃপর ব্রাসেলসে আসেন মার্কস। ১৮৪৭ সালের বসন্তে তিনি ও এঙ্গেলস 'কমিউনিস্ট লীগ' নামে একটি গুপ্ত প্রচার সমিতিতে যোগ দেন, লীগের দ্বিতীয় কংগেসে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং কংগ্রেস থেকে ভার পেয়ে সুপ্রসিদ্ধ 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' রচনা করেন। ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে তা প্রকাশিত হয়। প্রতিভাদীপ্ত স্বচ্ছতা ও উজ্জ্বলতায় এই রচনাটিতে রূপায়িত হয়েছে নতুন বিশ্ববীক্ষা, সমাজজীবনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য সুসঙ্গত বস্তুবাদ, বিকাশের সব থেকে সর্বাঙ্গীণ ও সুগভীর মতবাদ-দ্বান্দিকতা, শ্রেণি-সংগ্রামের তত্ত্ব এবং নতুন কমিউনিস্ট সমাজের স্রষ্টা প্রলেতানিয়েতের বিশ্ব-ঐতিহাসিক বিপ্লবী ভূমিকার তত্ত্ব।

১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব শুরু হলে মার্কস বেলজিয়াম থেকে নির্বাসিত হন। আবার তিনি প্যারিসে চলে এলেন এবং মার্চ বিপ্লবের পর ফিরে গেলেন জার্মানিতে, কলোন শহরেই। এইখানে প্রকাশিত হয় Neue Rheinische Zeitung পত্রিকা, ১৮৪৮ সালের ১ জুন থেকে ১৮৪৯ সালের ১৯ মে পর্যন্ত। মার্কস ছিলেন তাঁর প্রধান সম্পাদক। নতুন তত্ত্বের চমৎকার সমর্থন পাওয়া গেল ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের বৈপ্লবিক ঘটনাস্রোতে, যেমন তা সমর্থিত হয়েছে পরবর্তীকালে পৃথিবীর সব দেশের সমস্ত প্রলেতারীয় ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে। প্রথমে বিজয়ী প্রতিবিপ্লব মার্কসকে আদালতে অভিযুক্ত করে এবং পরে নির্বাসিত করে জার্মানি থেকে। প্রথমে প্যারিসে গেলেন মার্কস, ১৮৪৯ সালের ১৩ জুনের মিছিলের পর সেখান থেকেও পুনরায় নির্বাসিত হয়ে লন্ডনে আসেন এবং সেখানেই বাকি জীবন কাটান।

মার্কসের নির্বাসিত জীবন অত্যন্ত কষ্টে কাটে, মার্কস-এঙ্গেলস পত্রাবলি (১৯১৩ সালে প্রকাশিত) থেকে তা বিশেষ পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। অভাব-অনটনে মার্কস ও তাঁর পরিবার একেবারে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ওঠেন; এঙ্গেলসের নিরন্তর ও আত্মোৎসর্গী অর্থ সাহায্য না পেলে মার্কসের পক্ষে 'পুঁজি' বইখানি শেষ করা তো দূরের কথা, অভাবের তাড়নায় তিনি নিশ্চিতই মারা পড়তেন। তাছাড়া পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের সাধারণভাবে অপ্রলেতারীয় সমাজতন্ত্রের প্রাধান্যবিস্তারকারী মতবাদ ও ধারাগুলি মার্কসকে নিরন্তর কঠিন সংগ্রামে বাধ্য করেছে এবং মাঝে মাঝে অতি ক্ষিপ্ত বন্য ব্যক্তিগত আক্রমণও প্রতিহত করতে হয়েছে তাঁকে।

দেশান্তরী চক্রগুলি থেকে পৃথক হয়ে মার্কস তাঁর একাধিক ঐতিহাসিক রচনায় নিজের বস্তুবাদী তত্ত্ব নির্মাণ করেন এবং প্রধানত রাজনীতি সংক্রান্ত অর্থশাস্ত্রের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এই বিজ্ঞানটির ক্ষেত্রে মার্কস তাঁর 'রাজনীতি সংক্রান্ত অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে' (১৮৫৯) এবং পুঁজি (প্রথম খণ্ড, ১৮৬৭) রচনা করে বিপ্লব সাধন করেছেন।

৫০-এর দশকের শেষে ও ৬০-এর দশকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুনরুজ্জীবনের যুগ মার্কসকে আবার প্রত্যক্ষ কার্যকলাপের মধ্যে টেনে নেয়। ১৮৬৪ সালে লন্ডনে বিখ্যাত প্রথম আন্তর্জাতিক বা আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্কস ছিলেন এই সমিতির প্রাণস্বরূপ, তার প্রথম অভিভাষণ এবং বহুবিধ প্রস্তাব, ঘোষণা ও ইশতেহার তাঁরই রচনা। বিভিন্ন দেশের শ্রমিক আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করে, বিভিন্ন ধরনের মার্কসপূর্ব অ-প্রলেতারীয় সমাজতন্ত্রকে (মাতসিনি, প্রুধো, বাকুনিন, ইংল্যান্ডের উদারনৈতিক ট্রেড ইউনিয়নবাদ, জার্মানিতে লাসালপন্থীদের দোদুল্যমানতা) সংযুক্ত কার্যকলাপের পথে চালানোর চেষ্টা করে এবং এই সব সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীগুলির মতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে মার্কস বিভিন্ন দেশের শ্রমিকশ্রেণির প্রলেতারীয় সংগ্রামের একটি একক রণকৌশল গড়ে তোলেন। যে প্যারিস কমিউনের অমন সুগভীর পরিষ্কার, চমৎকার, কার্যকর, বৈপ্লবিক মূল্যায়ন মার্কস উপস্থিত করেন। আন্তর্জাতিকের হেগ কংগ্রেসের পর মার্কস আন্তর্জাতিকে সাধারণ পরিষদকে নিউইয়র্কে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করেন। প্রথম আন্তর্জাতিকের ঐতিহাসিক ভূমিকা শেষ হয়ে গিয়েছিল, পৃথিবীর সমস্ত দেশে শ্রমিক আন্দোলনের অপরিমেয় রকমের বৃদ্ধির একটা যুগের জন্যে, তার প্রসারবৃদ্ধি এবং বিভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্রের ভিত্তিতে ব্যাপক সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টি সৃষ্টির একটা যুগের জন্যেই তা পথ ছেড়ে দেয়।

আন্তর্জাতিকে প্রচুর কাজকর্ম এবং তত্ত্ব নিয়ে কাজের জন্যে কঠিনতর পরিশ্রমের ফলে মার্কসের স্বাস্থ্য চূড়ান্তভাবে ভেঙে গিয়েছিল। রাজনীতি সংক্রান্ত অর্থশাস্ত্রকে ঢেলে সাজানো এবং 'পুঁজি' বইখানি সম্পূর্ণ করার কাজ তিনি চালিয়ে যান, রাশি-রাশি নতুন তথ্য সংগ্রহ করেন ও একাধিক ভাষা (যথা রুশ) আয়ত্ত করেন। কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যে 'পুঁজি' সম্পূর্ণ করা তাঁর আর হয়ে উঠল না।

১৮৮১ সালের ২ ডিসেম্বর তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ১৮৮৩ সালের ১৪ মার্চ আরামকেদারায় বসে শান্তভাবে মার্কস তাঁর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। লন্ডনের হাইগেট সমাধিক্ষেত্রে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। মার্কসের সন্তানদের মধ্যে কয়েকজন বাল্যাবস্থাতেই মারা যায় লন্ডনে, যখন চরম অভাবের মধ্যে পরিবারটি বাস করছিল, তখন। এলিওনর অ্যাভেলিং, ল্যরা লাফার্গ ও জেনি লোঙ্গে – মেয়েদের এই তিনজনের বিয়ে হয় ইংরেজ ও ফরাসি সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে। শেষোক্ত জনের পুত্র ফরাসি সোশালিস্ট পার্টির একজন সভ্য।

** এপিকিউরস প্রখ্যাত প্রাচীন গ্রিক বস্তুবাদী দার্শনিক ও নিরীশ্বরবাদী।*

*** গেওর্গ ভিলহেলম হেগেল (১৭৭০-১৮৩১) – খ্যাতকীর্তি জার্মান বিষয়মুখ ভাববাদী দার্শনিক। ভাববাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন করেন।*

রাষ্ট্রীয় আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত বেঁচে থাকার অধিকার

(১ম পৃষ্ঠার পর) কিছু দিন আগেই অভিযোগ তোলে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালও গুমের অভিযোগ করে আসছে।

কোথায় গিয়ে থামবে?

'গুম-অপহরণে'র এসব ঘটনা বাংলাদেশের রাজনীতি এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য মামলা দায়ের করা, পুলিশ দিয়ে অযথা হয়রানি করা, বিনা বিচারে আটকে রাখার কাজ এদেশে ব্রিটিশ আমল থেকেই সরকারগুলো করেছে। ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামী, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা-কর্মী প্রায় সকলেই এসব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গিয়েছেন। এরপর এসেছে 'ক্রসফায়ার' আমল। শুধু চিহ্নিত অপরাধী নয়, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকেও বিনা বিচারে 'ক্রসফায়ার' নাম দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। শাসকদের ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতিতে সর্বশেষ সংযোজন 'গুম-অপহরণে'র ঘটনা।

যারা মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজকে ব্যাখ্যা করেন তারা রাষ্ট্রকে একটি দমনমূলক হাতিয়ার মনে করেন। আর এই দমন করার কাজটি প্রত্যক্ষভাবে করে অস্ত্রধারী বাহিনী অর্থাৎ সেনাবাহিনী, বিজিবি, পুলিশ, র‍্যাব প্রমুখ বাহিনী। মার্কসবাদ যারা মানেন না, কিন্তু একটা গণতান্ত্রিক সমাজ ও শাসন দেখতে চান, তারাও প্রত্যক্ষ নানা অভিজ্ঞতায় বুঝতে পেরেছেন যে রাষ্ট্রের এই অস্ত্রধারী বাহিনীর হাতেই প্রধানত রাষ্ট্রের নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব হতে থাকে। আর সে কারণেই তারা অস্ত্রধারী বাহিনীকে সবেচেয়ে বেশি জবাবদিহির অধীনে রাখা, নিয়মের অধীনে রাখার দাবি করেন। তা যদি করা না যায়, বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, এসব বাহিনীর হাতে সাধারণ মানুষ তো বটেই এমনকি শাসকগোষ্ঠীর সদস্যরাও নিরাপদে থাকেন না। র‍্যাব সদস্যদের হাতে নারায়ণগঞ্জের সাত খুনের ঘটনা, বিভিন্ন স্থানে র‍্যাব-পুলিশ সদস্যদের ডাকাতি, টাকা লুট বা অপহরণের সাথে যুক্ত থাকার ঘটনা তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। এর বিস্তৃতি শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে থামবে, তা সত্যি আশঙ্কার বিষয়।

বাড়ছে অবিশ্বাস ও সন্দেহ

সম্প্রতি গুম অবস্থা থেকে ফিরে এসেছেন কয়েকজন। দুই মাসের বেশি নিখোঁজ থেকে ফিরে এসেছেন সাংবাদিক উৎপল দাস। নিখোঁজদের মধ্যে তার আগে সর্বশেষ পরিবারের কাছে ফেরেন ব্যবসায়ী অনিরুদ্ধ রায়, তিনিও আড়াই মাস 'অজ্ঞাতবাসে' ছিলেন। উৎপলের পর ফিরেছেন একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোবাশ্বার হাসান সিজার। এরা প্রায় সবাই জানিয়েছেন যে মুক্তিপণ আদায়ের জন্য কিংবা ব্যবসায়িক বিরোধ থেকে তাদের অপহরণ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা যে বক্তব্য দিয়েছেন, মানুষ তা বিশ্বাস করতে পারছে না। এতদিন মানুষ সরকারি ভাষ্যে বিশ্বাস করত না, এখন গুম হওয়া লোকজনের ভাষ্যেও বিশ্বাস করতে পারছে না।

নিখোঁজ থাকা কয়েকজন যখন ফিরে আসছেন তখন ঠিক সে সময়ে আমরা দেখছি যে চার মাস আগে ঢাকা থেকে 'নিখোঁজ' বিএনপি নেতা ব্যবসায়ী সৈয়দ সাদাত আহমেদকে গ্রেপ্তারের কথা জানিয়েছে পুলিশ। সাদাতকে গত ২২ আগস্ট '১৭ কয়েকজন তুলে নিয়ে যায় বলে তার স্বজনরা জানিয়েছিলেন। ওই ঘটনার চার মাস পর ঢাকার রামপুরা এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তারের কথা জানায় গোয়েন্দা পুলিশ।

গুম-অপহরণ ঘটনার মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত ছিল বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিনের ঘটনাটি। ২০১৪ সালের ১০ মার্চ রাতে ঢাকার উত্তরা এলাকার একটি ভবন থেকে 'আইনশৃঙ্খলা বাহিনী' পরিচয়ে একদল অস্ত্রধারী সালাহউদ্দিন আহমদকে 'অপহরণ' করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। এক বছর দুই দিন 'গুম' থাকার পর ২০১৫ সালের ১২ মার্চ ভারতের মেঘালয় রাজ্যের রাজধানী শিলংয়ের গলফ কোর্স ময়দানে চোখবাঁধা অবস্থায় সালাহউদ্দিন আহমদকে পাওয়া যায়। এরপর এ বছর ফরহাদ মজহারকে অপহরণের চেষ্টা নিয়ে যে নাটকীয়তা দেশবাসী দেখেছেন তাতে বিশ্বাস অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব আরো তীব্র হয়েছে।

সংসদে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য উদ্বেগ বাড়িয়েছে

রূপকথার গল্পে এক রাক্ষসের কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন। সে যখন বলে উত্তরে যাবে, তখন সে যায় দক্ষিণে, যদি বলে পশ্চিমে যাবে, তখন সে যায় পূর্বে। ঠিক একই রকম না হলেও আমাদের দেশের সরকারের কর্তাব্যক্তিরা যখন যা বলেন, দেশের মানুষ তার বিপরীতটাই ভাবতে ও বিশ্বাস করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

যেমন আমাদের শিক্ষামন্ত্রী যখন বলেন, প্রশ্ন ফাঁস হয়নি, তখন আমরা বুঝতে পারি প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন বলেন, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অপরাধীকে গ্রেফতার করা হবে, তখন আমরা ভাবতে থাকি আগামী ৪৮ বছরেও অপরাধীকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর খোদ প্রধানমন্ত্রী যখন বলেন, 'গুম শুধু বাংলাদেশেই হয় না। ব্রিটেন আমেরিকায়ও হয়।' তখন আমরা ভাবতে থাকি যে গুম নামের এই হাতিয়ারটি সরকার আরো চাতুর্যের সঙ্গে ব্যবহার করবে।

সংসদে বিরোধী দলীয় প্রধান অভিযোগ করেছিলেন যে গত ৫ বছরে নিখোঁজ হয়েছে ৫১৯ জন মানুষ। তিনি বলেন যে মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। আর তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়েই প্রধানমন্ত্রী বলেন যে ব্রিটেন-আমেরিকার গুমের পরিস্থিতি বাংলাদেশের চেয়ে আরো ভয়াবহ।

অনেকেরই হয়তো মনে আছে, সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি নিজ বাসায় খুন হওয়ার পর তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন, অপরাধী যেই হোক ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাদের গ্রেফতার করা হবে। সেই ৪৮ ঘণ্টা আজো পার হয়নি। আর সে সময় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সমালোচনার মুখে প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিক দম্পতির দিকে কুৎসিত ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, 'কারো বেডরুম পাহারা দেওয়া সম্ভব নয়।' অথচ আইনের লঙ্ঘন যেখানেই হোক, বেডরুম অথবা রাজপথ, তার প্রতিকারের দায়িত্ব সরকার-প্রশাসনের। জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের।

আমরা মনে করি, শুধু বাংলাদেশ নয় সারা দুনিয়া জুড়েই রাষ্ট্রব্যবস্থা দিন দিন ফ্যাসিবাদী চেহারা নিচ্ছে। একেক দেশে তার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে একেকভাবে। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি শুরু থেকেই ফ্যাসিবাদী বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্ম নিয়েছে। আর যত দিন যাচ্ছে তার ফ্যাসিবাদী বৈশিষ্ট্য ততই প্রকট হচ্ছে। সরকার নিজেই অপরাধের জন্ম দিচ্ছে এবং সরকার জনগণের নিরাপত্তা ও অধিকার হরণ করছে। এর প্রতিকার কোথায়? আমরা বহুবার বলেছি যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধিই এর প্রতিষেধক। রাজপথে আন্দোলনের পাশাপাশি সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী মহলের সোচ্চার ভূমিকাও অত্যন্ত জরুরি।

কমরেড জয়জিৎ বড়ুয়া বিপ্লবী সংগ্রামে ছিলেন প্রাণবন্ত, জীবন্ত এক চরিত্র

বাসদ (মার্কসবাদী) চট্টগ্রাম জেলার শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

কমরেড জয়জিৎ বড়ুয়া ছিলেন প্রাণবন্ত, জীবন্ত এক চরিত্র। ছাত্রাবস্থায় তিনি সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহ আমানত হল ছাত্র সংসদের নির্বাচিত সহ-সভাপতি এবং ছাত্র ফ্রন্ট চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ২০০০ সালের ১ জানুয়ারি তাঁকে আমরা হারিয়েছিলাম মাত্র ৩৪ বছর বয়সে। সহজ-সরল জীবনযাপন, মানুষকে আপন করে নেবার ক্ষমতা, বিনয়ী কিন্তু দৃঢ় নীতিনিষ্ঠতা, উন্নত সংস্কৃতি দিয়ে কমরেড জয়জিৎ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের আপনজনে পরিণত হয়েছিলেন। ছাত্রজীবন শেষে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে বিপ্লবী পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। কমরেড জয়জিৎ বড়ুয়া আমাদের সামনে রেখে গেছেন – কী করে বিপ্লব ও শোষিত মানুষের সংগ্রামে একাত্ম হতে হয়। সে শিক্ষা গ্রহণ করে আমরা তাঁর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করি।

যে হাত সভ্যতা বাঁধাই করে

(১ম পৃষ্ঠার পর) ফেব্রুয়ারিতে বই মেলা কিংবা সারা বছর ধরে ছাপা বিভিন্ন প্রকাশনীর বিভিন্ন প্রকারের বই বাঁধাইয়ের কাজ হয় পুরানো ঢাকার একটা বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে। আমরা সুন্দর বাঁধাই বই হাতে পাই, জানিনা বাঁধল কে? জানিনা তার জীবনের বাঁধুনিটাই বা কেমন।

পুরনো বাড়ী। আলো-বাতাসহীন বদ্ধ ঘর। তার স্যাঁতসেতে মেঝেতে বিভিন্ন বয়সের লোক পুস্তক বাঁধাইয়ের কাজ করছে। এরা পুস্তক বাঁধাই শ্রমিক নামে পরিচিত। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বিদ্যুতের আলোতে চলে বই বাঁধাইয়ের কাজ। পাঠ্যবই থেকে শুরু করে কবিতা-গল্প-উপন্যাস কিংবা ধর্মগ্রন্থ – সবই বাঁধেন তারা। শিশু থেকে শুরু করে পঞ্চাশোর্ধ বয়সের মানুষরাও এ পেশায় জড়িত। এদের কাজের ধরনও আলাদা। কেউ ছাপানো বড় কাগজ ভাঁজ করেন, কেউবা ভাঁজ করা কাগজ সাজিয়ে রাখেন। কেউ সুঁইয়ে সুতা লাগিয়ে ফর্মাগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে দেন, যাতে ফর্মার কোনো ওলট-পালট না হয়। এইভাবে মলাট লাগানো, তারপর মেশিনে বইয়ের তিনধার কেটে ফিনিশিং দেওয়া ও প্যাকেজিং করার পর সেই বই আমরা বাজারে পাই। পাঠকের বইটি পড়ার সময় যাতে বিষয়ের ধারাবাহিকতার কোনো ব্যাঘাত না ঘটে সে জন্য শ্রমিকদের খুবই সতর্ক থাকতে হয় পুরো সময়টাতে। ছাপাখানা থেকে নিয়ে আসার পর শুরু করে বই বাঁধাই করা পর্যন্ত রাখতে হয় অখণ্ড মনোযোগ।

পুস্তক বাঁধাইয়ের কাজে শ্রমিকরা আসে মূলত টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর, সিরাজগঞ্জের চৌহালী ও মানিকগঞ্জের দৌলতপুর অঞ্চল থেকে। অভাবের তাড়নায়, জীবন ধারণের তাগিদে তারা ঢাকায় আসে। শুরু করে বাঁধাইয়ের কাজ।

এদের কাজের বিভিন্ন ধরন আছে। কেউ করে রোজ অনুযায়ী আবার কেউ দিন চুক্তি হিসেবে। সকাল ৮ থেকে শুরু হয় কাজ। সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ১ম রোজ এবং বিকেল ৫টা থেকে রাত ১০ পর্যন্ত ২য় রোজ আর রাত ১০টা থেকে রাত ১২ টা পর্যন্ত হাফ রোজ। যদি একজন শ্রমিক সকাল ৮টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত কাজ করে তাহলে তার মোট আড়াই রোজ কাজ হয়। তবে বেশির ভাগ শ্রমিকরা ২ রোজ পর্যন্ত কাজ করতে বাধ্য হয়। দুই রোজ মানে সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা। এই বাজারে ২ রোজ কাজ করা ছাড়া সংসার চলে না। একজন দক্ষ মজুরের প্রতি রোজ মজুরি ১৭৫ টাকা। ২ রোজ অর্থাৎ ১২ ঘন্টা কাজ করলে প্রতিদিন সর্বসাকুল্যে ৩৫০ টাকা মজুরি পেতে পারে একজন শ্রমিক। এর মধ্যে সারাদিনের খাবার বাবদ তাকে খরচ করতে হয় একেবারে কম করে হলেও ১০০ টাকা। তাহলে সারা মাস কাজ করলে খাবার খরচ বাদ দিয়ে তার হাতে থাকে মাত্র ৬০০০-৬৫০০ টাকা। এই টাকা দিয়ে নিজের ওষুধপত্র ও হাত খরচ বাদ দিলে পরিবারের জন্য গ্রামে পাঠাতে পারে খুবই সামান্য টাকা। একজন দক্ষ শ্রমিকের যদি এই অবস্থা হয় তাহলে অদক্ষ ও শিশু শ্রমিকদের কী অবস্থা তা অনুমান করা যায়। এই কারাখানাগুলোতে ১০/১২ বছরের শিশুরা খাবার ও মাসে ২০০০/৩০০০ টাকার বিনিময়ে দিন রাত কাজ করে, যে সময়ে তাদের স্কুলে যাওয়ার কথা! একমাত্র ঈদ উৎসব ছাড়া অন্য কোনো ছুটি তাদের নেই। সকল ধরনের উৎসব বোনাস থেকে তারা বঞ্চিত। উৎসবের সময় শুধুমাত্র মাসের মজুরি নিয়ে শুষ্ক মুখে শ্রমিকরা বাড়ি ফেরে। সাপ্তাহিক ছুটির দিন কিংবা শুক্রবার – তাদের কাজ কখনও বন্ধ হয় না।

বাঁধাই শ্রমিকরা কাজের জায়গাতেই খায়। কাজ শেষে জায়গা পরিষ্কার করে তারা লাইন দিয়ে ঘুমাতে যায়। কাজের মৌসুমে কারখানায় যখন প্রচুর কাগজ থাকে তখন তারা এর উপরেই ঘুমায়। আলো-বাতাসহীন অপরিষ্কার ঘর, স্যাঁতসেতে মেঝে আর কাগজের ধুলো-ময়লা – এর উপরই হাড়ভাঙা খাটুনির পর প্রায় নেতিয়ে পড়া শরীর নিয়ে শুয়ে পড়া। অত্যাবশ্যকীয়ভাবে লেগে থাকে হাঁপানি, চর্মরোগসহ নানা ধরনের রোগের প্রকোপ। কেউ অসুস্থ হলে বিশ্রামের জন্য কোনো জায়গা নেই। অসুস্থ হয়ে বইয়ের বান্ডিলের উপর বিশ্রাম নিতে গেলেও মালিক বা ম্যানেজারের গালিগালাজ শুনতে হয়। কারখানায় বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা নেই। লাইনের পানি পান করতে শ্রমিকরা বাধ্য। এই সেক্টরের শ্রমিকদের কাজের সময় দুর্ঘটনায় শারীরিক কোনো ক্ষতি বা মৃত্যু হলে মালিকপক্ষ রাষ্ট্র তার দায়-দায়িত্ব বহন করে না।

এইভাবে শ্রম দিতে দিতে তারা একসময় কাজ করার শক্তি হারায়। যখন আর কাজ করার সামর্থ্য থাকে না তখনি তাদের সময় হয় বাড়ি ফেরার। বাড়ি ফেরার সময় ভবিষ্যৎ জীবন নির্বাহের জন্য সরকারি-বেসরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো কোনো এককালীন টাকা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচিউটি বা শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের কোনো টাকা তাদের জোটে না। পরিশ্রম করার সামর্থ্যহীন দেহ নিয়ে তারা বাড়ি ফেরে। তখন নিঃস্ব অসহায় অবস্থায় শ্রমিকদের ধুঁকে ধুঁকে মরতে হয়।

বই মানুষের জীবনকে আলোকিত করে। কিন্তু বইয়ের কারিগররা আলোর দেখা পায় না। আর দেখা পায় না আরেকটি বস্তুর, সেটা হল মানবতা – যা ওই বইয়ে লেখা থাকে।

অক্টোবর বিপ্লবের শতবর্ষে দিনাজপুরে বামপন্থীদের র‍্যালি

গত ১২ ডিসেম্বর বিদ্যুৎসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভ

ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৭ ডিসেম্বর সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট, নোয়াখালী জেলার উদ্যোগে প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জেলা শাখার আহ্বায়ক তারকেশ্বর দেবনাথ নান্টু। আলোচনা করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি শুভ্রাংশু চক্রবর্তী। পরিচালনা করেন জেলার সদস্য দলিলের রহমান দুলাল। এছাড়া বিভিন্ন ইউনিটের প্রতিনিধিগণ সংগঠন ও আন্দোলন বিষয়ে মতামত দেন।

মুক্তিযুদ্ধের কিশোর পাঠ

'আমরা চাই প্রাণবন্ত শৈশব, দুরন্ত কৈশোর' – এই স্লোগান নিয়ে শিশু কিশোর মেলা, ঢাকা নগর শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো 'মুক্তিযুদ্ধের কিশোর পাঠ ২০১৭'। ২০ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু ভবনে গান, কবিতা আর চিত্রাঙ্কন কর্মশালার মধ্য দিয়ে কর্মসূচি শুরু হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময়কে কল্পনা করে 'রণাঙ্গন থেকে প্রিয় মানুষকে চিঠি লেখা'-র আয়োজন ছিল খুবই প্রেরণার। দিনের শেষে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক শিশুতোষ চলচ্চিত্র 'আমার বন্ধু রাশেদ' সকলকে '৭১ -এ ফিরিয়ে নিয়ে যায়। উন্নত রুচি আর বিকশিত জীবন গড়ার শপথ নিয়ে আয়োজন শেষ হয়।

এই অন্ধকার সময়ে সূর্য সেনের সংগ্রামী স্মৃতি ভীষণ অনুপ্রেরণার

১২ জানুয়ারি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ের মহানায়ক মাস্টারদা সূর্য সেনের ৮৮তম ফাঁসি দিবস। এ দিনটির সাথে জড়িয়ে আছে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস আর এক মহান বিপ্লবীর জীবনসংগ্রামের অমরগাথা।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলে পরাধীন ভারতবর্ষের এক কোণে বন্দর শহর চট্টগ্রাম। এর রাউজান থানার নোয়াপাড়া গ্রামে ১৮৯৪ সালের ২২ মার্চ সূর্য সেনের জন্ম। স্কুলে পড়ার সময়ই পরাধীনতার যন্ত্রণা, দেশবাসীর দুঃখ-কষ্ট সূর্য সেনের বুকে গভীর বেদনা জাগিয়েছিল। পিতৃতুল্য শিক্ষকের কাছে শুনেছেন এদেশের বড় মানুষদের গল্প। শিক্ষক পড়ে শুনিয়েছিলেন 'দেশের কথা' বইটি। কলেজে পড়ার সময়ই বিপ্লবী সংগ্রাম ও বিপ্লবীদের প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ তৈরি হয়। বিএ পাশ করে সূর্য সেন যোগ দেন উমাতারা উচ্চ বিদ্যালয়ে। ছাত্রদের পড়াশুনা করানোর পাশাপাশি তাদের নিয়ে গড়ে তোলেন ছাত্র সমিতি। ছাত্রদের মধ্যে যুক্তিবাদী মানসিকতা, দেশপ্রেম গড়ে তোলার জন্য বিতর্কসভা, সাহিত্যসভার আয়োজন করতেন। নিঃস্ব, অসহায়, গরীব মানুষের সেবা করার মধ্য দিয়ে মানুষের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করতে গড়ে তোলেন সেবা সমিতি। এভাবে শ্রদ্ধা, ভালোবাসায় সূর্য সেন হয়ে উঠেন সবার প্রিয় 'মাস্টারদা'।

এর মধ্যে ১৯১৯ সালে ঘটে গেল পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড। দেশের মানুষের উপর নৃশংস এ হত্যাকাণ্ড সূর্য সেনকে অস্থির করে তোলে। যন্ত্রণাদগ্ধ হৃদয়ে ভাবতে থাকেন – এ অত্যাচারেরর কি কোনো প্রতিকার নেই? পরাধীনতার গ্লানি কি ঘুচবে না? শপথ নেন, এমন সুদৃঢ় বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলতে হবে, যার আঘাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল কেঁপে উঠবে। সেসময় স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেসের মধ্যে দুটি ধারা ছিল। একটি গান্ধীর নেতৃত্বে আপোষমুখী অহিংসপন্থী ধারা, আরেকটি সুভাষ বসুর নেতৃত্বে আপোষহীন বিপ্লাত্মক ধারা, যারা বিশ্বাস করতেন আবেদন নিবেদন করে নয়, একমাত্র সশস্ত্র পথেই স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব। মাস্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা সুভাষ বসুকে সমর্থন করেন। সূর্য সেন ও তাঁর অনুগামীরা পরিকল্পনা করলেন এক সংগঠিত, পরিকল্পিত সশস্ত্র অভ্যুত্থানের, যা দেশবাসীর মুক্তিসংগ্রাম বেগবান করতে প্রবলভাবে উদ্দীপ্ত করবে। এ পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে প্রয়োজন ছিল বিস্তৃত বিপ্লবী সংগঠন, গণভিত্তি আর সশস্ত্রসংগ্রামের উপযোগী পরীক্ষিত নির্ভীক কর্মী।

সূর্য সেনের ছিল দুর্বল শরীর। কিন্তু তাঁর চোখে জ্বল জ্বল করা স্বাধীনতার স্বপ্ন, অল্প অল্প কথায় মর্মস্পর্শী আবেদন, সহজ সরল আন্তরিকতা, অনাড়ম্বর জীবন, গভীর দেশপ্রেম, দরদী মন ছাত্র-যুবকদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করত। তিনি তাঁদের বলতেন, "জন্মেছি যখন মৃত্যু তো অনিবার্য। মরবই যখন তখন সার্থক মৃত্যুবরণই শ্রেয় নয় কি? কোটি কোটি মানুষের দাসত্ব শৃঙ্খল মোচনের পথে যে মৃত্যু আসবে, তাই আমরা বরণ করব।" গণভিত্তি তৈরির উপর মাস্টারদা জোর দিয়েছিলেন। এজন্য চট্টগ্রাম শহরসহ আশেপাশের অঞ্চলে নানা ধরনের সেবামূলক কাজ পরিচালনার জন্য কর্মীদের পাঠাতেন।

তখনকার দিনে বিপ্লবীরা অস্ত্র কেনার টাকা সংগ্রহ করত কখনও কখনও ডাকাতি করে, এটাকে বলা হতো স্বদেশি ডাকাতি। মাস্টারদা এ পথ বর্জন করলেন। বললেন, "যাঁরা স্বদেশি, যাঁরা দেশের জন্য প্রাণ দেবে, তাঁরা অন্যের বাড়িতে ডাকাতি করবে কেন? তাঁরা নিজের ঘর থেকে আনবে, সেটাই তো তাঁদের আত্মত্যাগ।" এ আহ্বান শুনে কর্মীরা ঘর থেকে অর্থ এনে দলের তহবিলে দিত। বীরেন নামে এক দরিদ্র ঘরের কর্মী তাঁর মায়ের একমাত্র অলংকার মাস্টারদা'র হাতে তুলে দিয়েছিল। মাস্টারদা তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে অন্যদের বলেছিলেন, 'এটাই সবচেয়ে বড় দান!'

এভাবে প্রস্তুতির পর মাস্টারদার নেতৃত্বে ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল সংঘটিত হলো ঐতিহাসিক যুব বিদ্রোহ। বিপ্লবীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল করে। টেলিফোন-টেলিগ্রাফ অফিস দখল করে চট্টগ্রামের সাথে বাইরের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ব্রিটিশ বাহিনী যাতে শহরে ঢুকতে না পারে, তাই রেললাইন বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। অতর্কিত আক্রমণে ব্রিটিশ বাহিনী পরাস্ত হয়। দামপাড়া পুলিশ লাইনে সমবেত হয়ে 'ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি'র সভাপতি হিসেবে মাস্টারদা স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করেন। চট্টগ্রামবাসীর মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে প্রচারপত্র বিলি করা হয়। পরাধীন ভারতের বুকে চট্টগ্রাম চারদিন স্বাধীন ছিল।

২২ এপ্রিল বিশাল ব্রিটিশ বাহিনী চট্টগ্রাম শহরে প্রবেশ করে। জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নেয়া বিপ্লবীদের সাথে শুরু হয় সম্মুখ যুদ্ধ। সেখানেও ইংরেজরা পরাস্ত হয়। এরপর ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল, তারপর আরো দুই বছর চট্টগ্রাম শহরের দু'পাশে গ্রামাঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে নেওয়ার মতো দুঃসাধ্য সাধন করেছিল সূর্য সেনের বিপ্লবী বাহিনী। আত্মগোপন অবস্থায় থেকে সূর্য সেন নানা দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনা করেন। বিস্ময়ের ব্যাপার, চট্টগ্রাম শহরের কুড়ি কিলোমিটার এলাকার মধ্যে ব্রিটিশ মিলিটারি, পুলিশ, গোয়েন্দাদের নাকের ডগায় তিনটি বছর ধরে সূর্য সেন আত্মগোপন করে ছিলেন। তাঁকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। মিলিটারি ক্যাম্প বসিয়ে শহরের পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে তল্লাশি চালানো হয়েছিল। তারপরও মাস্টারদাকে ধরতে পারেনি ব্রিটিশ সরকার।

ব্রিটিশ শাসকরা প্রচার করতো সূর্য সেনরা 'সন্ত্রাসী', 'জনবিচ্ছিন্ন'। এসব প্রচারের প্রভাব পরবর্তীতেও অনেকের মধ্যে ছিল বা আজও আছে। অথচ সূর্য সেন সাধারণ মানুষের কত আপন ছিলেন। বোঝা যায় প্রচণ্ড বিপদ মাথায় নিয়েও, গ্রামের সাধারণ গরীব মানুষ, মুসলিম ঘরের মায়েরা পর্যন্ত তাঁকে বুক আগলে রক্ষা করেছিল। দেখা যেত পুলিশ বাড়ি তল্লাশি করছে, আর বাড়ির ভেতরের ঘরে মহিলাদের মধ্যে সূর্য সেন বসে আছেন। মাছ যেমন জলে বাঁচে, তেমনি মাস্টারদা সাধারণ মানুষের আশ্রয়ে বেঁচে ছিলেন। এরকম গণভিত্তি সেসময় অন্যান্য বিপ্লবী সংগঠনের ছিল না।

মৌলবাদী দলগুলো উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রচার করে, সূর্য সেন সাম্প্রদায়িক ছিলেন, মুসলিম বিরোধী ছিলেন। অথচ ইতিহাস বলে ভিন্ন কথা। তাঁর দলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য অবারিত দ্বার ছিল। গীতা হাতে, কালি প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে শপথ নেওয়া তাঁর দলে ছিল না। আত্মগোপনকালীন সময়ের বড় অংশ ছিলেন গরীব মুসলিম চাষীদের পরিবারে। মীর আহমেদ, আফসারউদ্দিন, আবদুস সাত্তার, কামালউদ্দিন আহমদ, সৈয়দুল হকের মতো মুসলিম তরুণদের মাস্টারদা বিপ্লবী হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। আত্মগোপনকালে সূর্য সেন মীর আহমেদের ঘরে কিছুদিন আশ্রয় নিয়েছিলেন। ঘরের মধ্যে একটা গর্তে মাস্টারদা থাকতেন, গর্তের উপর খাট বিছিয়ে আহমেদের মা শুয়ে থাকতেন। মাস্টারদা সাম্প্রদায়িক হলে, একটা রক্ষণশীল মুসলিম মায়ের ভালোবাসা কীভাবে অর্জন করলেন?

মাস্টারদার সংস্পর্শে প্রীতিলতা, কল্পনা দত্তের মতো সংগ্রামী নারী চরিত্র সৃষ্টি হয়েছিল। মাস্টারদা দেশবাসীর সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, শুধু পুরুষরা নয়, নারীরাও সশস্ত্র লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিতে পারে। প্রীতিলতা ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের সফল অভিযান শেষে আত্মাহুতি দেন। ১৯৩৩ সালের ১৬ জানুয়ারি ব্রিটিশ সৈন্যদের হাতে গ্রেপ্তার হলেন সূর্য সেন, তাও নেত্র সেনের বিশ্বাসঘাতকতায়। ব্রিটিশ সরকারের প্রহসনের বিচারে মাস্টারদা আর তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসির রায় হলো।

ভাবতে অবাক লাগে, এ দেশে একসময় মাস্টারদা সূর্য সেনের মতো বড় চরিত্র জন্ম নিয়েছিল! আজ যখন সর্বাত্মক সংকটের ঘোর অন্ধকার দেশের আকাশে, দেশের রাজনীতি-সমাজনীতি-শিক্ষা-সংস্কৃতি-মূল্যবোধের অবক্ষয় চারিদিকে তখন মাস্টারদা'র সংগ্রামী স্মৃতি আজও অম্লান। আজ দেশের জনগণ পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-শাসন থেকে মুক্তি চায়। এই লড়াইয়ে মাস্টারদা সূর্য সেন বিরাট প্রেরণা। মাস্টারদা সূর্য সেন – লাল সালাম!

(লেখাটি ভারতের এসইউসিআই(সি)'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মাস্টারদা সূর্য সেন' পুস্তিকা অবলম্বনে রচিত।)

শিক্ষাব্যবস্থায় চরম নৈরাজ্য, রমরমা বাণিজ্য

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পুরো শিক্ষাব্যবস্থাটাই আজ এক বিরাট ব্যবসার ক্ষেত্র

২০১৮ সালের শুরুতে দেশের এই সাধারণ মানুষের কাছে বার্তাটা খুবই স্পষ্ট। 'টাকা থাকলে সন্তানদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাবে।' যত টাকা খরচ করার সামর্থ্য আপনার আছে, আপনি সেই অনুপাতে দেশের অবস্থা সাপেক্ষে আপেক্ষিক অর্থে মানসম্মত শিক্ষা কিনে নিতে পারবেন। আগে দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব ভালো রেজাল্ট করতে দেখা যেত, তাদেরকে শিক্ষক ও অন্যান্যরা মিলে সহায়তা করতেন। এসব ঘটনা আজ কদাচিৎ, কিছু কিছু ঘটনা পত্রিকায় আসে। এখানে ধাপে ধাপে শিক্ষা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে গেছে এবং প্রতিটি পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই। দেশের শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো খেয়াল করলে আমরা দেখব –

■ এর মূল ধারাটা বেসরকারি। বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) এর তথ্যানুসারে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৯০ শতাংশের বেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বেসরকারি। তাদের ২০১৬ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪৯.৩৫ শতাংশ, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৯৫.৩৯ শতাংশ, কলেজসমূহের প্রায় ৯৩ শতাংশই চলছে বেসরকারি ধারায়। বাংলাদেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে ৩৮টি, অপরদিকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে ৯২টি। কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ৫ হাজার ৮৯৭টির মধ্যে বেসরকারি রয়েছে ৫ হাজার ৬০৯টি অর্থাৎ প্রায় ৯৫ শতাংশই বেসরকারি। এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সময় বড় অংকের টাকা লাগে, প্রতি মাসের বেতন ফি অনেক বেশি, আবার পাবলিক পরীক্ষার সময়ে বোর্ড নির্ধারিত ফি এর বাইরে বেশি ফি নেয়া হয়। মাসিক বেতন ও ভর্তি বাড়ানোর ব্যাপারে কোনো নিয়মাবলি সেখানে নেই। ফলে ভর্তি প্রক্রিয়া, বছর বছর ভর্তি ফি, মাসিক বেতন ও পরীক্ষার ফি – এই চার স্তরে স্কুলগুলোতে বাণিজ্য হয়। এগুলো হলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সরাসরি ব্যবসার দিক।

■ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পর একটা শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ হলো মূল্যায়ন ব্যবস্থা অর্থাৎ পরীক্ষাপদ্ধতি। বর্তমানে প্রথম থেকে দশম শ্রেণির মধ্যে পাবলিক পরীক্ষা চারটি। এই পরীক্ষাগুলো বাস্তবে ব্যবসার একটা বিরাট ক্ষেত্র। শিক্ষা গবেষক রাখাল রাহা এক হিসেবে দেখিয়েছেন, প্রত্যেক ছাত্র একটি করে গাইড বই কিনলেও শুধু পিইসি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে বছরে ১৭৫ কোটি টাকার ব্যবসা হওয়া সম্ভব। বাস্তবে তার আরও বেশিই হয়। আর এই পরীক্ষাগুলোকে কেন্দ্র করে যে কোচিং ব্যবসা হয় তার ছবিটিও ভয়ঙ্কর। 'এডুকেশন ওয়াচ' এর তথ্য মতে, বাংলাদেশে প্রায় ২ লক্ষ কোচিং সেন্টার আছে। এই কোচিং সেন্টারগুলোর আয় বছরে ৫০ হাজার কোটি টাকা। এছাড়াও প্রায় ৮৬ শতাংশ স্কুলে সাধারণ শ্রেণিকার্যক্রম বাদ দিয়ে কোচিং করানো হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। সেখানে আলাদা টাকা নেয়া হয়।

■ পরীক্ষার জন্য পড়াশোনা ও তার আয়োজনই শুধু নয়, এর প্রশ্নপত্র নিয়ে এখন চলছে একটা বিরাট ব্যবসা। প্রশ্নপত্র ফাঁস আজ একটা সাধারণ বিষয়। এখন কোন পরীক্ষার প্রশ্ন আগে পাওয়া যায় না? পিইসি, জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি, বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেলের ভর্তি পরীক্ষা, বিসিএস, ব্যাংকসহ দেশের বিভিন্ন দপ্তর-অধিদপ্তরের চাকুরির পরীক্ষা – সকল প্রশ্নপত্রই পাওয়া যায় পরীক্ষার আগে। এ সময়ের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর চিত্র হলো, স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্ন পর্যন্ত এখন ফাঁস হচ্ছে, তাও একেবারে প্রথম শ্রেণি থেকেই। ১৯৭৯ সালে এসএসসি পরীক্ষায় সর্বপ্রথম প্রশ্নফাঁসের ঘটনা ঘটে। ১৯৭৯ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত ২৯ বছরে ৫৫টি পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসের ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। আর 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ' (টিআইবি) র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে গত চার বছরেই বিভিন্ন পরীক্ষায় মোট ৬৩টি বিষয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে।

স্কুলের ভর্তিপরীক্ষা, ভর্তি, মাসিক বেতন, পরীক্ষার ফি নিয়ে ব্যবসা; পড়া ও পরীক্ষার ক্ষেত্রে গাইড বই ও কোচিং নিয়ে ব্যবসা – ফলে পুরো শিক্ষাব্যবস্থা আজ ব্যবসাকেন্দ্রিক। আবার 'শিক্ষার মানোন্নয়ন' এর নামে যত কাঠামোগত পরিবর্তন হয় সবগুলোই এক একটা ব্যবসার সুযোগ নিয়ে আসে। ১৯৯৬ সাল থেকে যখন ইংরেজিতে 'কমিউনিকেটিভ ইংলিশ' নিয়ে আসা হলো, তখন একে কেন্দ্র করে গাইড বইয়ের বিরাট বাজার তৈরি হয়। কীভাবে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে, কীভাবে পড়তে হয় – একে কেন্দ্র করে কোচিং ব্যবসাও জমে যায়। ঠিক একই কাণ্ড হল 'সৃজনশীল প্রশ্নপত্র' চালু করার সময়েও। শিক্ষার উন্নতি, বিকাশ, প্রসার – এ সকল কথা বলে যা-ই করা হোক না কেন, বাস্তবে তা ব্যবসা বাড়ানো ছাড়া অন্য কোনো উন্নতি করেনি।

পিইসি, জেএসসি আর কতদিন চলবে?

পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণির এই পরীক্ষাগুলোকেও বাস্তবে ব্যবসার ক্ষেত্র ছাড়া আর কিছু বলা সমীচীন হবে না। ব্যবসা ছাড়া আরেকটা ব্যাপার আছে সেখানে। সরকার 'মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল' বা 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' বাস্তবায়নের জন্য যেকোনোভাবে প্রাথমিক শিক্ষায় শতভাগ ছেলেমেয়ের অন্তর্ভুক্তি দেখাতে চায়, বিরাট একটা অংশ এই স্তর সমাপ্ত করেছে তাও দেখাতে চায়। ফলে ব্যবসায়ীদের ব্যবসা ও সরকারের বিশ্বসভায় করা অঙ্গীকার পূরণ করার কৌশল – এ দু'য়ের ফাঁদে পড়ে নিষ্পেষিত হচ্ছে আমাদের ছোট ছোট শিশুরা। এই পরীক্ষাগুলো তাদের উপর মানসিক চাপ তৈরি করছে, তাদের অভিভাবকদের উপর সীমাহীন আর্থিক চাপ তৈরি করছে। উপরন্তু ৮/১০ বছর বয়সেই পরীক্ষার আগে প্রশ্ন পাওয়াসহ নানা অনৈতিক কাজের সাথে পরিচিত হচ্ছে তারা। এই পরিস্থিতি দেখে অনেকে আবার প্রাথমিক স্তরে পাশ-ফেলই তুলে দিতে বলছেন। সেটাও সঠিক চিন্তা নয়। শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন হতে হবে, সেটা প্রতি বছর বার্ষিক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে স্কুলগুলো যেভাবে করত সেভাবে করবে। কিন্তু পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে দু'টো পাবলিক পরীক্ষা অবশ্যই বাতিল করা প্রয়োজন।

ব্যবসা হচ্ছে ব্যবসায়ীদের, অথচ শিক্ষকরা অনশনে

কিছুদিন আগে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরা অনশনে বসেছিলেন। তাঁদের দাবি ছিল বেতন বাড়ানোর, তাদের বেতন প্রধান শিক্ষকের পরবর্তী গ্রেডে আনার। এবার আন্দোলনে নেমেছেন সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজের শিক্ষকরা তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিও'ভুক্তির দাবিতে। সহকারী শিক্ষকের সংখ্যা সারাদেশে সাড়ে তিন লক্ষ, এমপিও'র দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষকদের সংখ্যা নয় লক্ষ। তারা যে আহামরি কিছু একটা দাবি করছেন তা নয়। তাদের দাবি বাস্তবসম্মত। অথচ এই দাবিকে কানেই তুলছে না সরকার। দেশে হাজার হাজার কোটি টাকার খেলাপী ঋণ পড়ে আছে বড় বড় ব্যবসায়ীদের হাতে। তার উপর গত পাঁচ বছরে গার্মেন্টস মালিকরা সরকারের কাছ থেকে নগদ সাহায্য পেয়েছে ৪ হাজার ২১৫ কোটি টাকা। গত নয় বছরে ৭০টা গার্মেন্টসের ঋণ মওকুফ করে দিয়েছে সরকার। অথচ দেশে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৫ হাজার টাকা। সহকারী শিক্ষকরা সব মিলিয়ে হাজার পনেরো বেতন পান। নন এমপিও বেসরকারি বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষকদের নির্দিষ্ট কোনো বেতনই নেই। দেশটা গড়বে কারা? কারা গুরুত্বপূর্ণ? শিক্ষকদের মানহীন জীবনে ফেলে রেখে মানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা করা কি সম্ভব? হাতে গোনা কিছু শিক্ষক ছাত্র পড়িয়ে একটা ভালো উপার্জন করেন। গোটা শিক্ষক সমাজের তারা কত অংশ? বাকিদের কী অবস্থা? হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক শিল্পপতিরা হরতালের কারণে ক্ষতি হয়েছে দেখিয়ে রাষ্ট্রের কাছে অর্থ সাহায্য পেতে পারেন, তাদের রাস্তায়ও নামতে হয় না। তাদের কর্পোরেট ট্যাক্স কমিয়ে দেয়া হয়, আমদানি শুল্ক মওকুফ করা হয়, ব্যাংক ঋণে সুদের হার কমিয়ে দেয়া হয়। অথচ দেশের শিক্ষকরা শীতের রাতে রাস্তায় শুয়ে থাকেন একটা মানসম্মত বেতনের দাবিতে।

শিক্ষাখাতে বাজেটে বরাদ্দ দিনের পর দিন কমছে। অথচ বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়ছে। গোটা অবস্থাটা চোখে আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, এটা এখন একটা ব্যবসার ক্ষেত্র এবং তা পুরোপুরি বেসরকারিকরণের দিকে যাচ্ছে। ফলাফলে শিক্ষার অধিকার সাধারণের নাগালের বাইরে যাচ্ছে। উপরন্তু ব্যবসা মানে সর্বোচ্চ মুনাফা। কোনোপ্রকার নীতি-নৈতিকতা-মূল্যবোধের ব্যাপার সেখানে নেই। খাটানো টাকা উঠে আসছে কিনা তাই দেখার বিষয়। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তোলার জন্য। এটা যদি ব্যবসার জায়গা হয় তাহলে এর মূল উদ্দেশ্যই আর থাকে না।

যে ছবিটি আমরা দেখতে চাইনি

আমাদের দেশের স্বল্প বেতনের কর্মচারী, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের সন্তানরাই দেশের শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে বড় অংশ। অথচ তাদের চড়া দামে শিক্ষা কিনে নিতে হচ্ছে। শিক্ষাকে ব্যবসার ক্ষেত্র করাটা সরকারের একটা খামখেয়ালিপনা নয়। সারা বিশ্বের ব্যবসায়ী-পুঁজিপতিদের যখন চরম দুর্যোগকাল, বিশ্ব পুঁজিবাদ যখন গভীর সংকটে নিমজ্জিত, তখন তারা ব্যবসায়ের আর কোনো ক্ষেত্র না পেয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সেবাখাতগুলোকে ব্যবসার জন্য উন্মুক্ত করে দিতে বলে। আমাদের মতো অনুন্নত দেশের মানুষও লেখাপড়ার জন্য খরচ করতে দ্বিধা করে না, অন্য সকল দিক সংকুচিত করে দিয়েও ছেলেমেয়ের লেখাপড়ায় খরচ করে। কারণ শিক্ষার সাথে দক্ষতা অর্জন সম্পর্কিত। ন্যূনতম শিক্ষা না থাকলে দক্ষতা অর্জন সম্ভব হয় না। দক্ষতার সাথে জড়িত মানুষের উপার্জন, তার বেঁচে থাকার মান, তার সামাজিক সম্মান। ফলে এখানে টাকা খাটালে মুনাফা নিশ্চিত। তাই সারা বিশ্বের ব্যবসায়ীদের সংগঠন WTO -এর সম্মেলনে ১৯৯৪ সালে GATS চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং বাংলাদেশ তাতে স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির মাধ্যমে দেশি-বিদেশি ব্যবসায়ীদের জন্য দেশের শিক্ষাখাত উন্মুক্ত করাকে সে নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে GATS -এর কার্যকরিতা আমরা আরও স্পষ্ট বুঝতে পারি। ফলে এখন কারও কথা, কারও দাবিই শোনার ব্যাপার সরকারের নেই। ধীরে ধীরে সবগুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই বেসরকারি খাতে যাবে এবং যারা ছাত্রবেতন ও অন্যান্য প্রক্রিয়ায় লাভ করে নিজেদের বাজারে টিকিয়ে রাখতে পারবে তারা থাকবে, বাকিরা বিদায় নেবে – সরকারের শিক্ষা সম্পর্কিত নীতি এটাই। একে না রুখে দিতে পারলে সামনে আমাদের জন্য এক ভয়ঙ্কর সময় অপেক্ষা করছে।

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা আর বাস্তবতায় এত ফারাক কেন?

(শেষ পৃষ্ঠার পর) উল্টো পথে হাঁটছে? বৈশ্বিক সম্মেলনে কয়লাসহ জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার কমিয়ে আনার অঙ্গীকারের পরও কেন এমন উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার? এর কোনো সদুত্তর নেই।

বিশ্বব্যাংকের 'বাংলাদেশ পরিবেশ সমীক্ষা-২০১' প্রতিবেদন বলছে, পরিবেশ দূষণের কারণে প্রতিবছর ৪২ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে, যা জাতীয় বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দের চেয়ে অনেক বেশি। একইসাথে বাড়ছে অকাল মৃত্যুসহ মানুষের রোগবালাই। বিশেষ করে বায়ুদূষণের মাত্রা এখন এতটাই ভয়াবহ যে, বিশ্বের দূষিত শীর্ষ নগরীগুলোর একটিতে পরিণত হয়েছে রাজধানী ঢাকা। প্রতি বছর প্রায় ৬ লাখ মানুষ সিসা দূষণের শিকার হচ্ছে। কয়লা পুড়িয়ে চলা ইটভাটাগুলো অর্ধেকের বেশি দূষণের জন্য দায়ী। সাথে যখন তখন রাস্তাঘাট খোড়াখুড়িসহ অপরিকল্পিত উন্নয়নের কারণেও ধূলাবালিতে নাকাল রাজধানীবাসী। বছর জুড়ে চলা এসব উন্নয়নে ন্যূনতম প্রতিরোধক ব্যবস্থা না নেয়ায় জনস্বাস্থ্য আজ চরম হুমকিতে। এতে শীত-গ্রীষ্মে বায়ু দূষণ আর বর্ষাকালের জলাবদ্ধতাসহ পানি দূষণে বিপর্যয় যেন নিয়তিতে পরিণত হয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, পরিকল্পিত উদ্যোগেই চলছে অপরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকান্ড! এই যেমন, সাভারে চামড়া শিল্পনগরী সরিয়ে নিয়ে বুড়িগঙ্গার মতোই ধলেশ্বরী নদীকে মেরে ফেলার কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

দূষণের কারণে পরিবেশের যখন এই বিপর্যয় তখন পরিবেশ রক্ষায় কাড়ি কাড়ি টাকা খরচ করছে সরকার। আগামী ৫ বছর পরিবেশগত দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ুর প্রভাব মোকাবেলাসহ 'পরিবেশ সুশাসন' -এর জন্য ৫৬ হাজার কোটি টাকা অর্থায়নে জাতীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি) হাতে নিয়েছে সরকার। যদিও পরিবেশ রক্ষায় সরকার আন্তরিক হলে নিশ্চয় কয়লাসহ জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমাতে সচেষ্ট হতো, উড়াল সেতুসহ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলো নিশ্চিত করত। কিন্তু এসবের ধারা কাছে নেই বর্তমান সরকার। বিশাল অংকের তথাকথিত উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিয়ে আসলে জনগণের টাকা লুটপাট করাই তাদের আসল উদ্দেশ্য।

সমাজের সকল অন্যায়কে প্রতিরোধ করার বছর

(২য় পৃষ্ঠার পর) কীভাবে? কোথায় যাব আমরা? পালাব? উপেক্ষা করব? নিজের কষ্টকে আপন করে সময় পার করব? তাতেও কোনো সমাধান হচ্ছে না। প্রায় প্রত্যেকেই তো আমরা দমন-পীড়নের শিকার হচ্ছি। তাই আমাদের অন্য কোথাও যাবার সুযোগ নেই। এখানে থেকেই সংকট সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। আবার একা একাও কোনো সমাধান করতে পারব না। যেহেতু সেগুলো আসছে সমাজ থেকে, তার সমাধানও করতে হবে সামাজিকভাবে। সমষ্টির শক্তি দিয়ে। কেবল রাজনীতির পালাবদলে কি এর পরিবর্তন আসবে? না। তেমন পালাবদল অতীতে এসেছে বারবার। আওয়ামী লীগের বদলে বিএনপি-জামাত, কখনো এসেছে সেনাশাসন। কিন্তু মানুষের ভাগ্যের তাতে পরিবর্তন আসেনি। তাহলে সমাধানে সূত্রটি কোথায় আছে?

আমরা এমন এক সমাজে বাস করছি যেখানে কোনো একজন কবি, লেখক, সাহিত্যিক, ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক, ইঞ্জিনিয়ার বা খেটে খাওয়া যেকোন মানুষ সততা নিয়ে, মর্যাদার সাথে বাঁচতে পারছে না। যে নারী স্বাধীনভাবে বাঁচতে চাইছে, তার প্রতি পদক্ষেপে সামাজিক আচার, পুঁজিবাদী ভোগবাদিতা আর ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে। যে শ্রমিক-মুটে-মজুর রাতদিন উদয়অস্ত পরিশ্রম করছে, সেও দু মুঠো অন্ন জোগাতে হিমশিম খাচ্ছে। শিল্পী-বিজ্ঞানী বা আর কেউ যাদের দেশের জন্য কিছু করার মন আছে, তাদেরকেও নতি স্বীকার করতে হচ্ছে। এর মধ্যেই কোনো রকমে টিকে আছি আমরা। কিন্তু একে কি বেঁচে থাকা বলে?

দেয়ালে এতটা পিঠ ঠেকার পরও কি আমরা ভেবে দেখব না – কে আমাদের আটকাচ্ছে? এমন অবস্থা কি যুগের পর যুগ চলতেই থাকবে এবং আমরা কেবল দেখব? অথবা পরিত্রাণের পথ না পেয়ে শেষ করে দেবে নিজেকে ও আপনজনদেরকে, যেমনটি ওই মেয়েটি করেছিল? এগুলোর কোনোটিই যে সঠিক পথ নয়, তা আমরা জানি। পথ জানতে হলে প্রথমেই জানতে এতসব সংকটের কারণ। তবেই বেরুবে তা থেকে উত্তরণের পথ। আজ স্পষ্টভাবেই আমাদের বুঝতে হবে, দেশের সকল সংকটের মূল কারণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। ফলে সমাধানের জন্য আজ যাই করি না কেন পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করার জন্য লড়াই করতেই হবে।

সভ্যতা আজ পুঁজিবাদের রাহুগ্রাস থেকে মুক্তি চাইছে, অপেক্ষা করছে নতুন পালাবদলের। চাইছে এমন এক সমাজের যেখানে মানুষে মানুষে সম্পর্ক বৈষম্যের হবে না, হবে বাধাহীন মৈত্রীর। মানুষ তার সামর্থ্য অনুযায়ী শ্রম দেবে, আর নেবে উৎপাদন অনুযায়ী। একসময় হবে – শ্রম দেবে সামর্থ্য অনুযায়ী আর নেবে প্রয়োজন অনুযায়ী। শ্রম হবে আনন্দের খোরাক, সৃষ্টিশীলতা হবে মানুষের নিত্য অভ্যাস। সেই সমাজ কষ্টকল্পনা নয়, বিজ্ঞানের নিয়মেই সেটি আসবে। ব্যক্তি মালিকানার অবসান ঘটে সৃষ্টি হবে সামাজিক মালিকানার। সেই সমাজের নাম সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদ।

আসছে ২০১৮ সাল হোক সেই অভিযাত্রার দিকে এক নতুন ধাপ। সমাজের সকল অন্যায়কে প্রশ্ন করা, প্রতিবাদ করা, প্রতিরোধ করার বছর। একবিংশ শতক তারুণ্যে পা দিয়েছে, গত শতকের এইরকম তরুণ বয়সে দুনিয়াকে কাঁপিয়ে দিয়ে রুশ বিপ্লব হয়েছিল। ২০১৮ সেই মহা দুঃসাহসী রক্তপতাকা বুকে বহন করুক।

কৃষি জমি ধ্বংস করা চলবে না

(শেষ পৃষ্ঠার পর) সেগুলোর টাকা জমির মালিকরা এখনো পুরোপুরি বুঝে পায়নি। এলাকার দালাল, ফড়িয়া, তথাকথিত জনপ্রতিনিধিরা টাকা পয়সা লুটে নিচ্ছে। এসব ব্যাপারে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছে একাধিকবার অভিযোগ করেও কোনো ফল মেলেনি।

শুধু লাঠশালা নয়, বেক্সিমকো কোম্পানি হাত বাড়িয়েছে পার্শ্ববর্তী ঘনবসতিপূর্ণ চর খোর্দা মৌজাতেও। চর খোর্দার মানুষগুলোকে জমি বিক্রি করার জন্য নোটিশ দিয়েছেন বেক্সিমকো কোম্পানির প্রকল্প সমন্বয়কারী ইয়ার আলী । শুধু তাই নয়, এলাকায় গজিয়ে ওঠা দালাল-মাস্তান বাহিনী প্রতিনিয়ত সাধারণ মানুষকে হুমকি দিচ্ছে। এমনকি সাজানো মামলার ফাঁদে ফেলে খেটে খাওয়া মানুষকে হয়রানি করা প্রতিদিনের ঘটনা।

অথচ চর খোর্দায় কোনো অকৃষি জমি নেই। কৃষি জমি ধ্বংস না করার সরকারি নির্দেশনা থাকলেও তা এ ক্ষেত্রে কেউই মানছেন না। এমনকি এ বিষয়ে এলাকাবাসী ও সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ইউএনও ও জেলা প্রশাসককে অবগত করা হলেও তাদের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

এলাকার মানুষ কৃষি জমি ধ্বংস করে এই সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প চায় না। তাদের আশংকা এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া তিস্তা নদী নিশ্চিহ্ন হবে। ফলে পরিবেশ বিপর্যয়ের পাশাপাশি এলাকার মানুষের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম উৎস মাছব্যবসা ও কৃষিকাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

নিজেদের ভিটেমাটি এলাকার পরিবেশ রক্ষার এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়েছে বাসদ (মার্কসবাদী) গাইবান্ধা জেলা। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলনকারীরা তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। কর্মসূচির অংশ হিসেবে আগামী ১৪ জানুয়ারি গাইবান্ধা জেলা প্রশাসক বরাবর, ১২ ফেব্রুয়ারি রংপুর বিভাগীয় কমিশনার বরাবর স্মারকলিপি প্রদানের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে 'বাস্তুভিটা ও আবাদী জমি রক্ষা সংগ্রাম কমিটি'।

ধর্ম নয়, অস্ত্র বিক্রির বাজারটাই আসল কথা

(১ম পৃষ্ঠার পর) কাজ করত। এইভাবে ফিলিস্তিনের বিরাট এলাকা নিজেদের অধিকারে নেওয়ার পর এই ধনী ইহুদিরা আরবদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করতে শুরু করে। স্বভাবতই আরব অধিবাসীরা ইহুদিদের বিরুদ্ধে ক্ষেপে ওঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পূর্ব ফিলিস্তিন ব্রিটিশ শাসকদের আওতায় আসে। কিছুদিনের মধ্যে ব্রিটিশ শাসকদের সাথে ইহুদিবাদীদের বিরোধ বাধে। ইহুদিবাদীদের পক্ষ নিয়ে বিষয়টিতে নাক গলাতে শুরু করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কৌশলী চালে আরব জনগোষ্ঠীগুলো আপত্তি উপেক্ষা করে রাষ্ট্রসংঘ ফিলিস্তিনকে দুইভাগে ভাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর একটি অংশ ফিলিস্তিন নামে আরবদের অধিকারে থাকে, আরেকটি অংশে তৈরি হয় ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েল। *(তথ্যসূত্র : গণদাবী, ডিসেম্বর, ২০১৭)*

বিগত ৬০ বছরেরও বেশি সময় ধরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আশীর্বাদপুষ্ট ইসরায়েল দফায় দফায় হামলা চালায় ফিলিস্তিনিদের উপর। ১৯১৩ সালে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন বা পিএলও-র সঙ্গে ইসরায়েলের একটি চুক্তি হয়। সেখানে পূর্ব জেরুজালেমকে ভবিষ্যতে ফিলিস্তিনের রাজধানী হিসেবে মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ততদিন পর্যন্ত জেরুজালেমকে 'আন্তর্জাতিক শহর' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ফিলিস্তিনিরা পূর্ব জেরুজালেমকে তাদের ভবিষ্যৎ রাজধানী করতে চায়। কিন্তু ১৯৬৭ সালে সাম্রাজ্যবাদী ইসরায়েল জেরুজালেমের পূর্বাংশ দখল করে নেয় এবং '৮০ সালে শহরটাকে তাদের রাজধানী ঘোষণা করে। যদিও বিশ্বের কোনো দেশই ইসরায়েলের এই অন্যায় দখলদারিত্বকে স্বীকৃতি দেয়নি।

এরই মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পূর্ব জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে ঘোষণা দিল। গোটা বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শান্তিপ্রিয় মানুষ ট্রাম্পের এই ঘোষণার বিরুদ্ধে ধিক্কারে ফেটে পড়েছে। ইরান, সিরিয়া, লেবাননের মতো আরবদেশগুলি তো বটেই এমনকি দেশে দেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী হানাদারির সঙ্গী ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানির মতো দেশগুলোও ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন দেয়নি। এরই জের ধরে যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি বাতিলে নিরাপত্তা পরিষদে ভোটাভুটিতে যুক্তরাষ্ট্র ভেটো দিলে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের দ্বারস্থ হয় ফিলিস্তিন। সাধারণ পরিষদে অধিকাংশ সদস্যরাষ্ট্র এতে সমর্থন জানায়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে আগামী অর্থবছরে জাতিসংঘে অর্থায়ন কমিয়ে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

মার্কিন নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী শিবির মধ্যপ্রাচ্যে তার নিজ প্রয়োজনেই ইসরায়েলকে মদত দিয়ে চলেছে এবং ফিলিস্তিনীদের দমনে সহযোগিতা করছে। মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদের উপর দখল প্রতিষ্ঠা ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই ইসরায়েলকে সমর্থন করে আমেরিকা। ২০০৬ সাল থেকেই ইসরায়েল গাজা ভূ-খণ্ড দখল করে রেখেছে এবং নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়েছে। জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী ঘোষণা করে এই অঞ্চলে সংঘর্ষের উত্তাপ বাড়িয়ে তুলতে পারলে আমেরিকার লাভ দুদিক থেকে। প্রথ মত, সামরিকীকরণের গতি বাড়িয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র ব্যবসা হু হু করে বাড়ানো যাবে। দ্বিতীয় লক্ষ্য, ইসরায়েলকে সামনে রেখে মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার পথে এগিয়ে যেতে পারবে আমেরিকা।

শুধু জেরুজালেম প্রশ্নে নয়, ট্রাম্প ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে নানা ধরনের বিতর্কিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা ট্রাম্পের পরিবেশ নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ট্রাম্পের পরিবেশ নীতি অনুযায়ী, জলবায়ু পরিবর্তনে মানুষের কর্মকাণ্ডের যে বিরাট প্রভাব রয়েছে তা অস্বীকার করা হয়। ফলে বিশ্ব পরিবেশ সুরক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা রাখা সংস্থা 'দ্য এনভায়রনমেন্টাল প্রটেকশন এজেন্সি' (ইপিএ) ছেড়ে চলে গেছে দুই শতাধিক বিজ্ঞানী।

ফিলিস্তিন ইসরায়েল সংঘাতকে মুসলমান ও ইহুদিদের মধ্যে ধর্মযুদ্ধ হিসেবে দেখার প্রবণতা আমাদের দেশে ব্যাপকভাবেই আছে। আমেরিকা যখন ইরাক বা আফগানিস্তানে হামলা চালায় তখন অনেকে একে মুসলিমদের ওপর খ্রিস্টানদের হামলা হিসেবে দেখায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই সঠিক নয়। বোঝা দরকার, যুদ্ধ ছাড়া সাম্রাজ্যবাদীদের বাঁচার উপায় নেই। পুরো মধ্যপ্রাচ্যে শিয়া-সুন্নির বিরোধ উস্কে দিয়ে তা থেকে অস্ত্রের ব্যবসা করছে আমেরিকা। সৌদিআরব আমেরিকার অস্ত্রের সবচেয়ে বড় খদ্দের। সম্প্রতি কাতারের সাথে বিরাট অস্ত্র বিক্রির চুক্তি করেছে আমেরিকা। সৌদিআরব এই অস্ত্র ব্যবহার করছে ইয়েমেনে। সেখানে খ্রিস্টান-মুসলমান নেই। মুসলমানরাই মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। দেশে দেশে যুদ্ধ বাঁধিয়ে তা থেকে ফায়দা লুটে নিজের অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখছে আমেরিকার মতো সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো।

পৃথিবীব্যাপী দমন-পীড়নের শিকার হচ্ছে সাধারণ মানুষ। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিকে শক্তিশালী হতে হবে। ইসরায়েলের প্রতি আমেরিকার অন্যায় সমর্থন ও ফিলিস্তিনীদের ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিশ্বের সকল শান্তিকামী ও বিবেকবান মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

উত্তর কোরিয়া নাকি আমেরিকা!

(শেষ পৃষ্ঠার পর) কোন ঘটনা আছে কি?

একটি পারমাণবিক যুদ্ধের সূচনা সাধারণ মানুষের জন্য কাঙ্ক্ষিত কোনো ঘটনা নয়। তেমন কিছু না ঘটলেও বিশ্বজুড়েই ছোট ছোট যুদ্ধ, আঞ্চলিক উত্তেজনা, যুদ্ধ-যুদ্ধ পরিস্থিতি বিরাজ করছে। আছে বাণিজ্যিক অবরোধ। আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর কোরিয়ার সাথে সরাসরি যুদ্ধ করতে না পারলেও একের পর এক বাণিজ্যিক অবরোধ চালিয়ে তাকে কোণঠাসা করতে চাইছে। নানাবিধ বৈশ্বিক অবরোধের মধ্যে থেকে উত্তর কোরিয়ার অভ্যন্তরের প্রকৃত চিত্র খুঁজে পাওয়া দুরূহ। অনেকেই সে দেশের মানুষের জীবন-জীবিকা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে চিন্তিত। সংবেদনশীল মানুষ মাত্রই সেসব নিয়ে চিন্তিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু একই সাথে এটাও চরম পরীক্ষিত সত্য যে, মার্কিন আগ্রাসন উত্তর কোরিয়ার অবস্থার কোনো উন্নতি ঘটাবে না। 'স্বৈরাচার উৎখাত' এর নামে গাদ্দাফি বা সাদ্দাম বিরোধী অভিযানের ফলাফল এখনো আমাদের চোখের সামনে বাস্তব।

উত্তর কোরিয়ার ভালো-মন্দ ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকার প্রথমত ও প্রধানত সে দেশের মানুষের। তাই একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আরেকটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশে যেকোনো অজুহাতে, যেকোনো ধরনের মার্কিন মিত্রশক্তির আগ্রাসনের তীব্রভাবে বিরোধিতা করা। উত্তর কোরিয়া কখনও যদি অন্য দেশকে বিনা কারণে আক্রমণ করে তাহলেও আমরা তার বিরুদ্ধে দাঁড়াব। কিন্তু উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক শক্তি অর্জন সম্পর্কে আমেরিকার একতরফা বক্তব্য আমরা কিছুতেই মানতে রাজি নই। যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে দুনিয়াকে রক্ষা করার একমাত্র পথ হলো দেশে দেশে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াই জোরদার করা।

জলবায়ু নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা আর বাস্তবতায় এত ফারাক কেন?

কয়লাসহ জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে আনা এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম আরও বেশি পরিবেশবান্ধব করার অঙ্গীকার এসেছে 'ওয়ান প্ল্যানেট' সম্মেলনে। সম্প্রতি প্যারিসে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে ৫টি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার একটি হলো দূষণ কমানো। 'ক্লাইমেট অ্যাকশন ১০০ প্লাস' এর উদ্যোগের অংশ হিসেবে পরিবেশ দূষণকারী তেল-গ্যাস-কয়লা উত্তোলনের সাথে জড়িত শত কোম্পানিকে চাপ প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। তালিকায় রয়েছে ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম (বিপি), শেভরন, মাইনিং গ্রুপ, আরসেলর মিত্তাল এর মতো বহুজাতিক কোম্পানি। ওই সম্মেলনে কয়লা খাতে জড়িত কোম্পানিগুলোতে বিনিয়োগ বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে ফ্রান্সের বিমা কোম্পানি এক্সা। তারা প্রায় তিনশ কোটি ডলার বা ২৪ হাজার কোটি টাকা তুলে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এমনকি বিশ্বব্যাংক ২০১৯ সালের পর থেকে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে বিনিয়োগ করবে না বলে ঘোষণা দিয়েছে। এক কথায় বৈশ্বিক উষ্ণতা বা তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার কমিয়ে আনতে কার্বন নিঃসরণ কতটা কমানো যায় সেই প্রতিশ্রুতি ছিল 'ওয়ান প্ল্যানেট' সম্মেলনে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও অংশগ্রহণকারী হিসেবে অঙ্গীকার করেছেন জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে আনার।

একইভাবে গত বছরের নভেম্বরে জার্মানিতে অনুষ্ঠিত বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলনেও শীর্ষ ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরেছিল বাংলাদেশ। ক্ষতি মোকাবেলায় 'উন্নত' ও দায়ী দেশগুলোর কাছ থেকে প্রত্যাশিত সহযোগিতা না পাওয়ায় ক্ষোভও জানিয়েছিল। ঘটনা দুটি পর্যবেক্ষণ করলে মনে হবে সত্যিই বুঝি বর্তমান সরকার পরিবেশ দূষণ হ্রাসে বদ্ধ পরিকর। তারা বোধ হয় কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে আনতে চায়। কিন্তু ভুল ভাঙতে খুব বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি! প্রধানমন্ত্রীর প্যারিস সম্মেলনে করা অঙ্গীকারের মাত্র ক'দিনের মাথাতেই সংবাদকর্মীদের ঘুরিয়ে দেখানো হলো দেশের সবচেয়ে বড় কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের অগ্রগতির চিত্র।

পটুয়াখালীতে লাখ লাখ টন কয়লা পুড়িয়ে পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দুটি ইউনিট থেকে উৎপাদন করা হবে ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। এর আগে দেশের মানুষের তীব্র বিরোধিতার পরও সুন্দরবনের কোল ঘেঁষে কয়লাভিত্তিক রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের কথা আমরা জানি। এরপরে আছে মাতারবাড়ি তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র। মোদ্দাকথা, দূষণের কারণে চীন, ভারত, যুক্তরাজ্য, জার্মানিসহ সবাই যখন কয়লার ব্যবহার কমিয়ে আনছে; তখন বাংলাদেশ কয়লার ব্যবহার বাড়ানোর উদ্যোগ জোর কদমে এগিয়ে নিচ্ছে।

জ্বীবাশ্ম জ্বালানির অন্যতম একটি হলো কয়লা, আর সবচেয়ে বেশি কার্বন নিঃসরণও হয় কয়লা থেকে। খনি থেকে উত্তোলন ও ব্যবহারের মাধ্যমের বিষাক্ত সালফার ছড়িয়ে পড়ায় মারাত্মকভাবে পরিবেশ দূষিত হয়। গত ডিসেম্বরে ভারতের দিল্লিতে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররা দূষণ সইতে না পারে মুখে মাস্ক পড়ে খেলেছে। দিল্লির বাতাস এখন এতটাই বিষাক্ত যে কিছুদিন পর পর তাদের অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ছুটি ঘোষণা করতে হচ্ছে। বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় শীর্ষ দশে দিল্লিকে নিয়ে যাওয়ার পেছনে বড় অবদান রেখেছে কয়লার প্রবল ব্যবহার। চীনের অবস্থা তো আরও মারাত্মক। সেখানে বোতলের পানি কেনার মতো বিশুদ্ধ বাতাস কেনা-বেচা শুরু হয়েছে। দূষণ থেকে বাঁচতে প্রায় ১২'শ কয়লা খনি বন্ধ এবং কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ কলকারখানা কমিয়ে দেয়ার কথা জানিয়েছে দেশটি। যুক্তরাজ্যসহ প্রথম বিশ্বের অনেকগুলো দেশ এখন ধীরে ধীরে কয়লা থেকে বেড়িয়ে নবায়ণযোগ্য জ্বালানির দিকে ঝুঁকছে। তাহলে আমাদের শাসকেরা কেন একের পর এক কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে মরিয়া হয়ে উঠেছে? প্রতিবেশি দেশসহ বিভিন্ন দেশে কয়লা ব্যবহারের বিপদ দেখেও কেন তারা *(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

কৃষি জমি ধ্বংস করে বিদ্যুৎ প্রকল্প করা যাবে না

গাইবান্ধা শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে সুন্দরগঞ্জ। সুন্দরগঞ্জ শহর থেকে পাকা সড়ক ধরে ৬ কিলোমিটার দূরে চৈতন্য বাজার। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে বাঁশের সাঁকো পার হয়ে মেঠোপথ ধরে আরো ৪ কিলোমিটার পায়ে হাঁটার পর তারাপুর ইউনিয়নের চর খোর্দা।

চর হলেও এখানকার মানুষগুলোর বসতি অন্তত ৫০ বছর ধরে। গাছ-গাছালি, আবাদী জমি, বাড়ি ঘর, দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৮টি মসজিদ, দুটি ঈদগাহ মাঠ, দুটি কবরস্থান, মাদ্রাসা, খেলার মাঠ, বাজার সবই আছে। অন্য আট-দশটি গ্রামের মতোই চর খোর্দা। গ্রামের প্রবীণ আব্দুর রহিম মন্ডল (৭০) বললেন, দফায় দফায় নদী ভাঙনে তারা যখন নিঃস্ব প্রায়, তখন বাপ-দাদারা আশ্রয় নেন চর খোর্দায়। পাশ দিয়ে বয়ে চলা তিস্তা নদী। তিস্তা এখনো ভাঙে। তবে চর খোর্দায় এখনো তিস্তার ভাঙন ধরেনি। নদীর গতি প্রবাহ পরিবর্তনের ফলে তিস্তার ভাঙন থেকে এ জনপদ অনেকটা নিরাপদ বলেই মনে করে এলাকাবাসী। সেই থেকেই বংশ পরম্পরায় মিলেমিশে চর খোর্দায় বসবাস করছে অন্তত পাঁচশ পরিবার।

এই গ্রামে বসবাসকারী মানুষগুলো সবাই কৃষিনির্ভর। মরিচ, ভুট্টা, বাদাম, রসুন, পেঁয়াজ, ধান, গম, পাটসহ নানান কৃষি ফসল ফলিয়ে সন্তানদের মুখে দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের যোগান দেয় তারা। চাষবাসের মধ্য দিয়ে এক সময়কার মঙ্গা কাটিয়ে ওঠার লড়াইটা এখনো থামেনি।

এভাবে জীবন যখন চলছে, তখনই থমকে যাওয়ার মত অবস্থায় পড়েছেন তারা। সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের নামে তাদের ভিটেমাটি, বাড়িঘর, আবাদী জমি সবই কেড়ে নেয়ার ষড়যন্ত্র বড় দুশ্চিন্তায় ফেলেছে গতর খাটা মানুষগুলোকে। দেশের বেক্সিমকো পাওয়ার কোম্পানি এবং চীনের টিবিয়ে কোম্পানিকে কাজ দেয়ার জন্য প্রায় এক হাজার একর জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এই ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করতে লড়াইয়ে নেমেছে এ অঞ্চলের শিশু, নারী-পুরুষ সবাই। গঠন করেছে 'বাস্তুভিটা আবাদী জমি রক্ষা সংগ্রাম কমিটি'।

সরকার সম্প্রতি দু'শ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কাগজে কলমে গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জের লাঠশালায় অকৃষি জমিতে এই প্রকল্প স্থাপনের কথা বলা থাকলেও তা মানা হচ্ছে না। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান সেই নিয়ম অমান্য করছে। তারা ইতিমধ্যে লাঠশালায় কৃষি ও অকৃষি মিলে প্রায় ৬শ' একর জমি ক্রয় করেছে। ক্রয় পদ্ধতি নিয়েও উঠেছে অভিযোগ। জমির বাজার মুল্যের চেয়ে অনেক কম দামে এলাকার মানুষকে কোম্পানির কাছে জমি বিক্রি করতে বাধ্য করার অভিযোগ উঠেছে। যেসব জমি বিক্রি হয়েছে *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

উত্তর কোরিয়া নাকি আমেরিকা! দুনিয়ার জন্য হুমকি কে?

গেল বছর সারা পৃথিবীর মানুষের উদ্বেগের অন্যতম বিষয় ছিল আমেরিকা-উত্তর কোরিয়া সম্পর্ক। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে যায় কিনা সেই নিয়ে নানান আলোচনায় মেতে ছিল বিশ্ব-মিডিয়া। এই যুদ্ধ উত্তেজনা যদিও একেবারে নতুন কিছু না, তবু এবছরের মাঝামাঝি উত্তর কোরিয়ার দূর পাল্লার সফল মিসাইল ক্ষেপণ (যা তাত্ত্বিকভাবে আমেরিকাতেও আঘাত হানতে সম্ভব) এবং নিজেকে পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হিসেবে দাবি করা তাতে নতুন মাত্রা এনেছে।

পারমাণবিক বোমা মানুষের জন্যে কল্যাণকর কিছু বয়ে আনতে পারে না; একথা যেমন সত্য তেমনি একে অন্য আরেকটি দিক থেকেও ভেবে দেখা দরকার। বিগত কয়েক দশক ধরেই কোরীয় সীমান্তে আমেরিকা এবং দক্ষিণ কোরিয়া দ্বিবার্ষিক সামরিক মহড়া চালিয়ে যাচ্ছে – সেটা যে উত্তর কোরিয়াকে চাপে রাখার একটা অংশ তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। জবাবে উত্তর কোরিয়া প্রতিবারই পাল্টা সামরিক মহড়া বা এরকম মিসাইল ক্ষেপণের চেষ্টা চালিয়েছে, যেমনটি এবারও আমরা দেখতে পেলাম এবং এখন নিজেকেই পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হিসেবে দাবি করছে উত্তর কোরিয়া।

অনেক বিশেষজ্ঞের মতেই উত্তর কোরিয়ার এই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির প্রচেষ্টা যুক্তরাষ্ট্রে হামলা করার জন্যে নয়, বরং আত্মরক্ষার জন্য। যুক্তরাষ্ট্রের বার্ষিক সামরিক বাজেট যেখানে ১০০০ বিলিয়ন ডলারের কাছে সেখানে উত্তর কোরিয়ার বাজেট মাত্র নয় বিলিয়ন ডলার। প্রযুক্তির দিক থেকেও উত্তর কোরিয়া বেশ পিছিয়ে। তবু লিবিয়া, ইরাক বা সিরিয়ার মতো উত্তর কোরিয়া যে এখনো আমেরিকার আগ্রাসনের শিকার হয়নি তার অন্যতম কারণ দেশটির 'সম্ভাব্য পারমাণবিক বোমা তৈরির সক্ষমতা' – এটা বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না।

আমেরিকাসহ বুর্জোয়া মিডিয়ার একতরফা প্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে শিক্ষিত-সচেতন মানুষদের একটা ব্যাপার ভেবে দেখা দরকার – আমেরিকার একক আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিশ্বশান্তি রক্ষার গ্যারান্টি কী? এ প্রশ্ন কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেও উঠেছিল। আমেরিকা পারমাণবিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে যখন তখন, যাকে তাকে হুমকি দেবে, এর ঘরের উপর চড়াও, ওর উপর হামলা চালাবে – আর কেউ এর বিরুদ্ধে দাঁড়ালেই সবাইকে বলবে দেখ, আমাকে খেপাচ্ছে। এটা মেনে নিয়ে কি দুনিয়ায় শান্তি আসতে পারে? আমেরিকার কাছে দাসখত লিখে দিয়ে থাকাটাই কি শান্তিতে থাকা? দুনিয়ার ভারসাম্যের জন্যই তখন সামরিক শক্তিতে সোভিয়েতকে আমেরিকার সমকক্ষ হতে হয়েছে। তখন আমেরিকা যেসব জায়গায় অন্যায্য হস্তক্ষেপ করতে চেয়েছে সেগুলোকে রুখে দেয়া গেছে।

উত্তর কোরিয়া সামরিক শক্তিতে আমেরিকার সমকক্ষ নয়। কিন্তু তার আত্মরক্ষার অধিকার আছে। আমেরিকা তার সামরিক শক্তি দিয়ে বিশ্বের কতগুলো দেশকে নিঃশেষ করেছে তার তালিকা করতে গেলে গবেষণার দরকার পড়বে না। শুধু বর্তমানে কী করছে তার অংশবিশেষ বোঝার জন্য মধ্যপ্রাচ্যের দিকে তাকালেই চলবে। কিন্তু উত্তর কোরিয়ার সে রেকর্ড আছে কি? উত্তর কোরিয়া তাবৎ দুনিয়ার জন্যে হুমকি হয়ে উঠছে, এই জুজুর ভয় দেখাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু তারা নিজেরা কী করেছে? তথাকথিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে বিশ্বের কয়েকটি দেশকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছে, লক্ষ লক্ষ বেসামরিক লোককে হত্যা করেছে। এর বিপরীতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো উত্তর কোরিয়ার ভিন দেশে হামলা বা বেসামরিক লোককে আঘাত করার *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা- ১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩। ওয়েবসাইট : www.spbm.org । ই-মেইল : mail@spbm.org